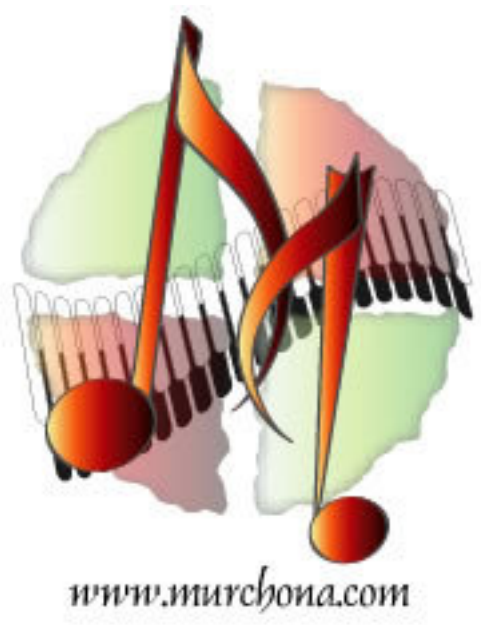


# Deshe Bideshe by Syed Mujtoba Ali

## [Part.1]

**For More Books & Music Visit www.MurchOna.com**
**MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum**
**suman_ahm@yahoo.com**

# দেশে বিদেশে

সৈয়দ মুজতবা আলী

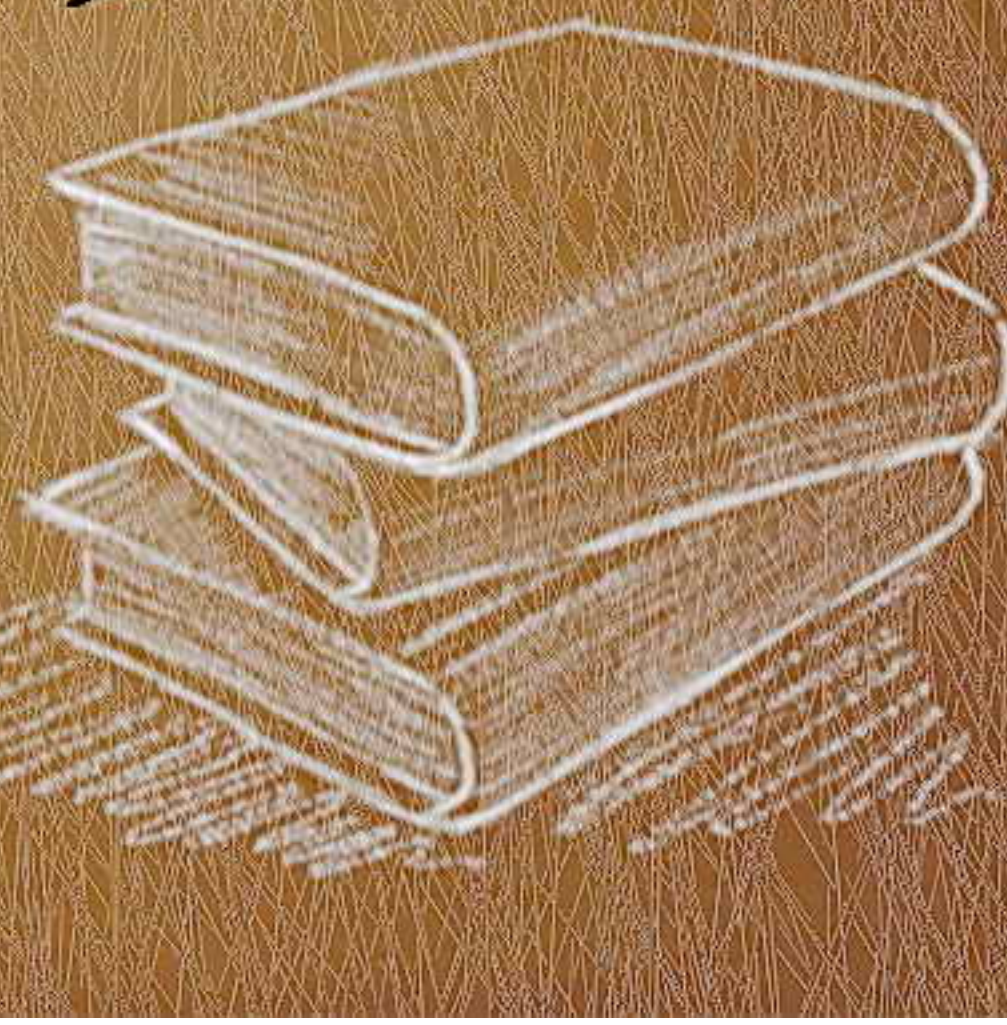

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

## এক

চাঁদনী থেকে ন'সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালীর জন্য ইয়োরোপীয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গী হেঁকে বলল, 'এটা ইয়োরোপীয়নদের জন্য।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, ইয়োরোপীয়ন তো কেউ নেই। চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অন্ত্য-দেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরেজী শব্দের প্রাদেশে জোর দিয়া কথা বললে সায়েবী ইংরেজী হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেব্‌লে অ্যাকসেণ্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মত—সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাঙলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা। ফিরিঙ্গী তালতলার নেটিব, কাজেই আমার ইংরেজী শুনে ভারি খুশী হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁধে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো। মাসীপিসী রেলে কাজ করে—কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসৎ পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত—মনে হল, আমি একা।

ফিরিঙ্গীটি লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ?' বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িঙ ফার?' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশী বলতে পার—দুটোর যে কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ' যেন ইলিসিয়াম রো'র প্রশ্ন—ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

www.MurchOna.com

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকান্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে' নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরী করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরোদস্তুর পন্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিব বস্তু, হয়ত বড্ড বেশী ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আ লা কার্ত ভোজন, যার যা খুশী খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগী মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিককাবাবের জায়গায় শামীকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে কীপ-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে কেনা।'

একদম হুবহু একই সব্জি। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গী মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গীকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াঁসের একটা বর্ণনা দিতে কিন্তু থেমে গেলুম। কি আর হবে বেচারীর সন্দেহ বাড়িয়ে—তার উপর দেখি বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা—কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। ক্ষিদে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই ঘুম পাচ্ছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজ্যোৎস্না। তবুও পষ্ট চোখে পড়ে এ বাঙলা দেশ নয়। সুপারি গাছ নেই, আম-জামে ঘেরা ঠাসবুনুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে। উঁচু পাড়িওয়ালা ইঁদারা থেকে তখনো জল তোলা চলছে—পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হল বন্ধ—দমকা হাওয়ায় পোড়া ধুলো মাঝে মাঝে চড়াৎ করে যেন থাবড়া মেরে যায়। এই আধা আলো-অন্ধকারে যদি এদেশ এত কর্কশ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কি রকম হবে। এই পশ্চিম, এই সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষ? না, তা তো নয়। বঙ্কিম যখন সপ্তকোটি

www.MurchOna.com

কন্ঠের উল্লেখ করেছেন তখন সুজলা সুফলা শুধু বাঙলা দেশের জন্যই। ত্রিংশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাণ্ঠরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হরেন ঘোষ দাঁড়িয়ে ? এ্যাঁ ? হাঁ ! হরেনই তো ! কি করে ? মানে ? আবার গাইছে 'ত্রিংশ কোটি, ত্রিংশ কোটি, কোটি কোটি—'

নাঃ, এতো চেকার সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে। 'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট' বলে চেঁচাচ্ছে। থার্ড ক্লাশ—ইয়োরোপীয়ন হলে কি হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে টিকিট চেক না করলে ও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ধড়মড় করে জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়োরোপীয়ন কম্পার্টমেন্ট' দিশী বেশ ধারণ করেছে—বাক্স তোরঙ্গ প্যাটরা চাঙারি চতুর্দিকে ছড়ানো। ফিরিঙ্গী কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে—এক টুকরো চিরকুট লাগানো, তাতে লেখা 'গুড লাক ফর দি লঙ জার্নি।'

ফিরিঙ্গী হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক—তালতলার লোক—ঐ তালতলাতেই ইরানী হোটেলে কতদিন খেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মোগলাই খানার কায়দাকানুন শিখিয়েছি, স্কোয়ারের পুকুর-পাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই আর ফিরিঙ্গীতে মেম সায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত স্যাৎসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজিতে যাকে বলে 'মডলিন'—তখ নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিস। কিন্তু উপস্থিত সে গবেষণা থাক—ভবিষ্যতে যে তার বিস্তর যোগাযোগ হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌর-চন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কি রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের ওস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশীক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ। আরো শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিণী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে পশ্চিমের সকাল বেলাকার রোদ্দুর বিলম্বিত আর বাদবাকী দিন দ্রুত।

www.MurchOna.com

গাড়ি যেন কালোয়াৎ। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্দুরের তবলচীকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠান্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জার-দের প্রাণ যায়। ইস্টিশানে ইস্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই রোদ্দুর প্ল্যাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে আড়নয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—বাঘা তবলচী যে রকম দুই গানের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম চাটিম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে ওস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন্ কোন্ ইস্টিশান গেল, কে গেল না তার হিসেব রাখিনি। সে-গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে
দৃষ্টি যায়—দগ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনোখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ তীর ও তীর ব্যাপী—শুষিয়াছে কোন ক্রূর যক্ষ
তার স্নিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধারে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ-পদ্য ছাপানো হয়নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।

## দুই

গাঁয়ের পাঠশালার বুড়ো পন্ডিতমশাই হাই তুললেই তুড়ি দিয়ে করুণ কণ্ঠে বলতেন, 'রাধে গো, ব্রজসুন্দরী, পার করো, পার করো।' বড় হয়ে মেলা হিন্দী, উর্দু পড়েছি, নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে কিন্তু 'পার করো, পার করো' বলে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করতে কাউকে শুনিনি।

www.MurchOna.com

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা পার হতে এতদিন বাদে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম। নামগুলো ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি, ম্যাপে ভালো করে চিনে নিয়েছি আর কল্পনায় দেখেছি, তাদের বিরাট তরঙ্গ, খরতর স্রোত। ভেবেছি আমাদের গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, বুড়ীগঙ্গা এনাদের কাছে ধুলপরিমাণ। গাড়ি থেকে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হয় না, এঁরাই ইতিহাস-ভূগোলে নামকরা মহাপুরুষের দল। কোথায় তরঙ্গ আর কোথায় তীরের মত স্রোত! এপার-ওপার জুড়ে শুকনো খাঁ-খাঁ বালুচর, জল যে কোথায় তার পাত্তাই নেই, দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুয়েরই প্রয়োজন। তখন বুঝতে পারলুম, ভবযন্ত্রণা পশ্চিমাদের মনে নদী পার হবার ছবি কেন এঁকে দেয় না। এসব নদীর বেশীর ভাগ পার হবার জন্য ঠাকুরদেবতার তো দরকার নেই, মাঝি না হলেও চলে। বর্ষাকালে কি অবস্থা হয় জানিনে, কিন্তু ঠাকুরদেবতাদের তো আর কিস্তিবন্দি করে মৌসুমমাফিক ডাকা যায় না; তিন দিনের বর্ষা, তার জন্য বারো মাস চেল্লাচিল্লি করাও ধর্মের খাতে বেজায় বাজে খর্চা।

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনুদুস লালাজীদের মিষ্টি মিষ্টি 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ'ফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া,' পাঞ্জাবীদের 'তুসি, অসি', আর শিখ সর্দারজীদের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার। পুরুষে যে রকম মেয়েদের কেশ নিয়ে কবিতা লেখে এদেশের মেয়েরা বোধ করি সর্দারজীদের দাড়ি সম্বন্ধে তেমনি গজল গায়; সে দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে। তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? তেয়োফিল গতিয়েরের এক উপন্যাসে পড়েছি, ফরাসী দেশে যখন প্রথম দাড়ি কামানো আরম্ভ হয় তখন এক বিদগ্ধা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'চুম্বনের আনন্দ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল। শ্মশ্রুঘর্ষণের ভিতর দিয়ে প্রেমিকের দুর্বার পৌরুষের যে আনন্দঘন আস্বাদন পেতুম ফরাসী স্ত্রীজাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। এখন থেকে ক্লীবের রাজত্ব। কল্পনা করতেও 'ঘেন্নায়' সর্বাঙ্গ রী রী করে ওঠে।'

ভাবলুম, কোনো সর্দারজীকে এ বিষয়ে রায় জাহির করতে বলি। ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি তখন এ দেশের মহিলামহলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি-তারিফ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাবগতিক দেখে সাহস

www.MurchOna.com

পেলুম না। এদেশের কোন্ কথায় কখন যে কার 'সখ্‌ৎ বেইজ্জতী' হয়ে যায়, আর 'খুনসে' তার 'বদলাঈ' নিতে হয়, তার হদীস তো জানিনে—তুলনাত্মক দাড়িতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দেব নাকি? এরা যখন বেণীর সঙ্গে মাথা দিতে জানে তখন আলবৎ দাড়িবিহীন মুন্ডও নিতে জানে।

সামনের বুড়ো সর্দারজীই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন। 'গোয়িঙ ফার?' নয়, সোজাসুজি 'কহা জাইয়েগা?' আমি ডবল তসলীম করে সবিনয়ে উত্তর দিলুম—ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতিমিষ্ট মোলায়েম হাসি। বিচক্ষণ লোকও বটেন, বুঝে নিলেন নিরীহ বাঙালী কৃপাণ-বন্দুকের মাঝখানে খুব আরাম বোধ করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন পেশোয়ারে কাউকে চিনি না, হোটেলে উঠব। বললুম, 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কি করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।'

সর্দারজী হেসে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালী নামে না, আপনি দু'মিনিট সবুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।'

আমি সাহস পেয়ে বললুম, 'তা তো বটেই, তবে কিনা শর্ট পরে এসেছি—'

সর্দারজী এবার অট্টহাস্য করে বললেন, 'শর্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা নয়, তবে কিনা ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে হয়ত ভালো হত।'

সর্দারজীকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, 'এও তো তাজ্জবকী বাৎ—'পাঞ্জাবী' পরলে বাঙালীকে চেনা যায়?'

আমি আর এগুলুম না। বাঙালী 'পাঞ্জাবী' ও পাঞ্জাবী কুর্তায় কি তফাৎ সে সম্বন্ধে সর্দারজীকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরো বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'সর্দারজী শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে?'

বললেন, দিল্লীতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালামুসায় সাড়ে ছয়, রাওয়ালপিন্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ারে এক লম্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুল্লুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।'

www.MurchOna.com

'বিশ গজ !'

'হ্যাঁ, তাও আবার খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।'

আমি বললুম, 'এ রকম একবস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কি করে ? মারপিট, খুনরাহাজানির কথা বাদ দিন।'

সর্দারজী বললেন, 'আপনি বুঝি কখনো বায়োস্কোপে যান না ? আমি এই বুড়ো বয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলে-ছোকরাদের গতিগতি বোঝবার উপায় নেই—আমার আবার একপাল নাতি-নাত্নী। এই সেদিন দেখলুম, দুশো বছরের পুরোনো গল্পে এক মেম সায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন—মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশ গজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মন্দা পাঠান বিশগজী শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন ?'

আমি খানিকটা ভেবে বললুম, 'হক কথা ; তবে কিনা বাজে খর্চা।'

সর্দারজী তাতেও খুশী নন। বললেন, সে হল ঊনিশবিশের কথা। মাদ্রাজী ধুতি সাত হাত, জোর আট ; অথচ আপনারা দশ হাত পরেন।

আমি বললুম, 'দশ হাত টেকে বেশী দিন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরা যায়।'

সর্দারজী বললেন, 'শিলওয়ারের বেলাতেও তাই। আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাঠান প্রতি ঈদে নূতন শিলওয়ার তৈরী করায় ? মোটেই না। ছোকরা পাঠান বিয়ের দিন শ্বশুরের কাছ থেকে বিশগজী একটা শিলওয়ার পায়। বিস্তর কাপড়ের ঝামেলা—এক জায়গায় চাপ পড়ে না বলে বহুদিন তাতে জোড়াতালি দিতে হয় না। ছিঁড়তে আরম্ভ করলেই পাঠান সে শিলওয়ার ফেলে দেয় না, গোড়ার দিকে সেলাই করে, পরে তালি লাগাতে আরম্ভ করে—সে যে-কোনো রঙের কাপড় দিয়েই হোক, পাঠানের তাতে বাছবিচার নেই। বাকী জীবন সে ঐ শিলওয়ার পরেই কাটায়। মরার সময় ছেলেকে দিয়ে যায়—ছেলে বিয়ে হলে পর তার শ্বশুরের কাছ থেকে নূতন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপের শিলওয়ার দিয়ে চালায়।'

সর্দারজী আমাকে বোকা পেয়ে মস্করা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন বুঝতে না পেরে বললুম, 'আপনি সত্যি সত্যি জানেন, না আপনাকে কেউ বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছে ?'

সর্দারজী বললেন, 'গভীর বনে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বাঘের দেখা—বাঘ বললে, 'তোমাকে আমি খাব।' এ হল গল্প, তাই বলে বাঘ মানুষ খায় সেও কি মিথ্যে কথা ?'

www.MurchOna.com

অকাট্য যুক্তি। পিছনে রয়েছে আবার সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা, কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম, 'আমরা বাঙালী, পাজামার মর্ম আমরা জানব কি করে ? আমাদের হল বৃষ্টিবাদলার দেশ, খালবিল, পেরতে হয়। ধুতিলুঙ্গী যে রকম টেনে টেনে তোলা যায়, পাজামাতে তো তা হয় না।'

মনে হয় এতক্ষণে যেন সর্দারজীর মন পেলুম। তিনি বললেন 'হাঁ, বর্মা মালয়েও তাই। আমি ঐ সব দেশে ত্রিশ বছর কাটিয়েছি।'

তারপর তিনি ঝাড় বেঁধে নানা রকম গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য কতটা বানিয়ে বলা সে কথা পরখ করার মত পরশ পাথর আমার কাছে ছিল না, তবে মনে হল ঐ বাঘের গল্পের মতই। দু'চারজন পাঠান ততক্ষণে সর্দারজীর কাছে এসে তাঁর গল্প শুনতে আরম্ভ করেছে —পরে জানলুম এদের সবাই দু'দশ বছর বর্মা মালয়ে কাটিয়ে এসেছে— এদের সামনে সর্দারজী ঠিক তেমনি-ধারা গল্প করে যেতে লাগলেন। তাতেই বুঝলুম, ফাঁকির অংশটা কমই হবে।

আড্ডা জমে উঠল। দেখলুম, পাঠানের বাইরের দিকটা যতই রসকষ-হীন হোক না কেন, গল্প শোনাতে আর গল্প বলাতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তর্কাতর্কি করে না, গল্প জমাবার জন্য বর্ণনার রঙতুলিও বড় একটা ব্যবহার করে না। সব যেন উড্‌কাটের ব্যাপার—সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে, কিন্তু ঐ নীরস নিরলংকার বলার ধরনে কেমন যেন একটা গোপন কায়দা রয়েছে যার জন্য মনের উপর বেশ জোর দাগ কেটে যায়। বেশীর ভাগই মিলিটারী গল্প, মাঝে মাঝে ঘরোয়া অথবা গোষ্ঠী-সংঘর্ষণের ইতিহাস। অনেকগুলো গোষ্ঠীর নামই সেদিন শেখা হয়ে গেল—আফ্রিদী, শিনওয়ারী, খুগিয়ানী আরো কত কি! সর্দারজী দেখলুম এদের হাড়হদ্দ সবকিছুই জানেন, আমার সুবিধের জন্য মাঝে মাঝে টিকাটিপ্পনী কেটে আমাকে যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিফহাল করে তুলেছিলেন। ফুরসৎমাফিক আমাকে একবার বললেনও, 'ইংরেজ-ফরাসীর কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাশ করেছেন, অন্য কোনো কাজে সেগুলো লাগবে না। তার চেয়ে পাঠানদের নাম বুনিয়াদ শিখে নিন, পেশওয়ার খাইবারপাসে কাজে লাগবে।'

সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।

পাঠানদের গল্প আবার শেষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে। ভাঙা ভাঙা পশতু উর্দু পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প শেষ করে বলবে, 'তখন তো আমার কুছ মালুমই হল না, আমি যেন শরাবীর বেহুশীতে মশগুল। পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠান্ডা, তখন দেখি বাঁ হাতের দুটো আঙুল

www.MurchOna.com

উড়ে গিয়েছে। এই দেখুন।' বলে বাইশগজী শিলওয়ারের ভাঁজ থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল।

আমি দরদ দেখাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাসপাতালে কতদিন ছিলেন?'

সবে পাঠানিস্থান এক সঙ্গে হেসে উঠল; বাবুজীর অজ্ঞতা দেখে ভারী খুশি।

পাঠান বলল, 'হাসপাতাল আর বিলায়তী ডাগদ্‌র কহাঁ, বাবুজী? বিবি পট্টি বেঁধে দিলেন, দাদীমা কুচকুচ হলদভী লাগিয়ে দিলেন, মোল্লাজী ফুঁফুঁকার করলেন। অব্‌ দেখিয়ে, মালুম হয় যেন আমি তিন আঙুল নিয়েই জন্মেছি।'

পাঠানের ভগিনীপতিও গাড়িতে ছিল; বলল, 'যে-তিনজনের কথা বললে তাদের ভয়ে আজরাঈল (যমদূত) তোমাদের গাঁয়ে ঢোকে না—তোমাকে মারে কে?' সবাই হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর দাদীজানের কেচ্ছা ওকে বলতে বলুন না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের পর পাথর গড়িয়ে ফেলে কি রকম করে একটা পুরোদস্তুর গোরা পল্টনকে তিন ঘন্টা কাবু করে রেখেছিলেন।'

সেদিন গল্পের প্লাবনে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ডুবে গিয়েছিল। আর কী খানাপিনা! প্রতি স্টেশনে আড্ডার কেউ না কেউ কিছু না কিছু কিনবেই। চা, শরবৎ, বরফজল, কাবাব, রুটি, কোনো জিনিসই বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে খায় কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। আমি দু'একবার আমার হিস্যা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম। বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্যকব্যূহ ভেদ করে দরজায় পৌঁছবার বহু পূর্বেই কেউ না কেউ পয়সা দিয়ে ফেলেছে। আপত্তি জানালে শোনে না, বলে 'বাবুজী এই পয়লা দফা পাঠানমুল্লুকে যাচ্ছেন, না হয় আমরা একটু মেহমানদারী করলুমই। আপনি পেশাওয়ারে আড্ডা গাড়ুন, আমরা সবাই এসে একদিন আচ্ছা করে খানাপিনা করে যাবো।' আমি বললুম, 'আমি পেশওয়ারে বেশীদিন থাকব না।' 'কিন্তু কার গোয়াল, কে দেয় ধুয়ো। সর্দারজী বললেন, 'কেন বৃথা চেষ্টা করেন? আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে পর্যন্ত একবার পয়সা দিতে দিল না। যদি পাঠানের আত্মীয়তা-মেহমানদারী বাদ দিয়ে এদেশে ভ্রমণ করতে চান, তবে তার একমাত্র উপায় কোনো পাঠানের সঙ্গে একদম একটি কথাও না বলা। তাতেও সব সময় ফল হয় না।'

পাঠানের দল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা গরীব, পেটের ধান্দায় তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়াই, আমরা মেহমানদারী করব কি দিয়ে?'

www.MurchOna.com

সর্দারজী আমার কানে কানে বললেন, 'দেখলেন বুদ্ধির বহর ? মেহমানদারী করার ইচ্ছাটা যেন টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে।

## তিন

সর্দারজী যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পেঁছতে আর মাত্র ঘন্টা-খানেক বাকী। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাব-রুটিতে আর ম্লানাভাবে আমার গায়ে তখন আর একরত্তি শক্তি নেই যে বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করি। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ এই যে, আমাদের কাছে যে কাজ কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তাল সামলে, দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে উপরের ব্যাঙ্কের বিছানা বাঁধা আর দেশলাইটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাঠান কোনো তফাৎ দেখতে পায় না। বাক্স-তোরঙ্গ নাড়াচাড়া করে যেন অ্যাটাচি কেস।

ইতিমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠান-মুল্লুকের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের। শুনে গর্ব অনুভব করছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পেঁছবে রাত ন'টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পেঁছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা ঠা আলো, ন'টা বাজল কি করে, আর পেশাওয়ারে পেঁছলুমই বা কি করে ? একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল হয়ে গিয়েছিল যে শেষের দিকে ঘড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এখন চেয়ে দেখি সত্যি ন'টা বেজেছে। তখন অবশ্য এসব ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে হয়রান হবার ফুরসৎ ছিল না, পরে বুঝতে পারলুম পেশাওয়ার এলাহাবাদের ঘড়ি-মাফিক চলে বলে কান্ডটা খুবই সদ্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক—তখন আবার জুন মাস।

প্ল্যাটফরমে বেশী ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ্য করলুম যে ছ'ফুটী পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালীত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে

www.MurchOna.com

বললেন, তাঁর নাম শেখ আহাম্মদ আলী। আমি নিজের নাম বলে এ হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দু'হাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ—পরম উৎসাহে, গরম সমবর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে। চিৎকার করে যে লাফ দিয়ে উঠিনি তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে তখনো গাড়ির পাঠানের দুটো আঙুল উড়ে যাওয়ার গল্প অবচেতন মনে বাসা বেঁধে অর্ধচেতন সহিষ্ণুতায় আমাকে উৎসাহিত করছিল। তাই সেদিন পাঠান-মুল্লুকের পয়লা কেলেঙ্কারি থেকে বাঙালী নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে পারল। কিন্তু হাতখানা কোন্ শুভলগ্নে ফেরৎ পাব সে কথা যখন ভাবছি তখন হঠাৎ আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানী কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সমান উঁচু হলে সেদিন কি হত বলতে পারিনে কিন্তু আমার মাথা তাঁর বুক অবধি পৌঁছায়নি বলে তিনি তাঁর এক কড়া জোরও আমার গায়ে চাপাতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশতুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অনুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায়—'ভালো আছেন তো' মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো?' আমি 'জী হাঁ, জী না, করেই যাচ্ছি আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতুম। পরে ওয়াকিফহাল হয়ে জানলুম, বন্ধু দর্শনে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই, দেওয়া কায়দা নয়। উভয় পক্ষ একসঙ্গে প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে যাবেন অন্ততঃ দু'মিনিট ধরে। তারপর হাত-মিলানা, বুক-মিলানা শেষ হলে একজন একটি প্রশ্ন শুধাবেন, 'কি রকম আছেন?' আপনি তখন বলবেন, 'শুকুর, আল্-হম্দুলিল্লা।' সর্দিকাশির কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে হলে তখন বলতে পারেন—কিন্তু মিলনের প্রথম ধাক্কায় প্রশ্নতরঙ্গের উত্তর নানা ভঙ্গিতে দিতে যাওয়া 'সখ্ৎ বেয়াদবী!'

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিচ'ড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না, আমি বাঙালী তিনি পাঠান, তবে যে এত সমবর্ধনা করেছেন তার মানে কি? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মত আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না—আর সে অতিথি যদি বিদেশী হয় তা'হলে তো আর কথাই নেই। তারো বাড়া, যদি সে অতিথি পাঠানের তুলনায় রোগ-দুব্লা সাড়ে পাঁচফুটী হয়। ভদ্রলোক পাঠানের মারপিট করা মানা।

www.MurchOna.com

তাই সে তার শরীরের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। রোগাদুব্‌লা লোক হাতে পেলে আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তখন উপভোগ করে—যদিও জানে যে কাজের বেলায় তার গায়ের জোরের কোনো প্রয়োজনই হবে না।

টাঙ্গা তো চলেছে পাঠানী কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয়——গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমুল্লুকে লোকজন যার যে রকম খুশী চলে, গাড়ী এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘন্টা বাজানো, চিৎকার করা বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে 'সবাধীন', রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার 'সবাধীনতা' রইল কোথায়? কিন্তু ঐ সবাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ঘোড়ার নালের চাট লেগে যদি তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে যায় তা'হলে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশ ডাকাডাকি করে না। পরম অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না?' গাড়োয়ানও সবাধীন পাঠান—ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

দেখলুম পেশাওয়ারের বারো আনা লোক আহমদ আলীকে চেনে, আহমদ আলী বোধ হয় দশ আনা চেনেন। দু'মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি থামান আর পশতু জবানে কি একটা বলেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জানান, 'আপনার সঙ্গে খেতে বললুম। আপত্তি নেই তো?'

আহমদ আলীর স্ত্রীর সৌভাগ্য বলতে হবে—কারণ তিনিই রাঁধেন, পর্দা বলে বাড়েন না—যে তাঁদের বাড়ি স্টেশনের কাছে, না হলে সে রাত্রে আহমদ আলীর বাড়িতে পাঠানমুল্লুকের জিরগা বসে যেত।

সরল পাঠান ও সুচতুর ইংরেজে একটা জায়গায় মিল আছে। পাঠান-মাত্রই ভাবে বাঙালী বোমা মারে, ইংরেজদেরও ধারণা অনেকটা তাই। আহমদ আলী সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর। আমি তার বাড়ি পৌঁছবার ঘন্টাখানেকের ভিতর এক পুলিশ এসে আহমদ আলীকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তিনি সেটা পড়েন আর হাসেন। তারপর তিনি রিপোর্টখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাতে রয়েছে আমার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এবং বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে যে লোকটা বাঙালী—আহমদ আলী যেন উক্ত লোকটার অনুসন্ধান করে সদাশয় সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।

আহমদ আলী কাগজের তলায় লিখলেন, 'ভদ্রলোক আমার অতিথি'।'

আমি বললুম, 'নাম-ধাম মতলবটাও লিখে দিন—জানতে চেয়েছে যে।'

www.MurchOna.com

আহমদ আলী বলেন, 'কী আশ্চর্য, অতিথির পিছনেও গোয়েন্দাগিরি করব নাকি ?'

আমি ভাবলুম পাঠানমুল্লুকে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ফলাই। বললুম, 'কর্ম করে যাবেন নিরাসক্ত ভাবে, তাতে অতিথির লাভলোকসানের কথা উঠবে না, এই হল গীতার আদেশ।'

আহমদ আলী বললেন, হিন্দুধর্মে শুনতে পাই অনেক কেতাব আছে। তবে আপনি বেছে বেছে একখানা গীতের বই থেকে উপদেশটা ছাড়লেন কেন ? তা সে কথা থাক। আমি বিশ্বাস করি কোনো কর্ম না করাতে, সে আসক্তই হোক আর নিরাসক্তই হোক। আমার ধর্ম হচ্ছে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা।'

'উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা' কথায় আমার মনে একটু ধোঁকা লাগল। আমরা বলি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব এবং এই রকম চিৎ হয়ে শুয়ে থাকাটা ইংরেজ পছন্দ করে না বলে 'লাইঙ সুপাইন' কর্মটি প্রভুদের পক্ষে অপকর্ম বলে গণ্য হয়। পাঠানে ইংরেজে মিল আছে পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম তাই বোধ হয় পাপটা এড়াবারও আরামটি বজায় রাখার জন্য পাঠান উবুড় হয়ে শুয়ে থাকার কথাটা আবিষ্কার করেছে।

আমার মনে তখন কি দ্বিধা আহমদ আলী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি না জানিনে। নিজের থেকেই বললেন, তা না হলে এদেশে রক্ষা আছে ! এই তো মাত্র সেদিনের কথা। রাত্রে বেরিয়েছি রোঁদে—মশহুর নাচনেওয়ালী জান্‌কী বাঈ কয়েক দিন ধরে গুম, যদি কোনো পাত্তা মেলে। আমি তো আপন মনে হেঁটে যাচ্ছি—আমার প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে জন আষ্টেক গোরা সেপাই কাঁধ মিলিয়ে রাত্তিরের টহলে কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসঙ্গে এক লহমায় অনেকগুলো রাইফেলের কড়াক্-পিঙ্। আমিও তড়াক করে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লুম, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের নর্দমায়। সেখানে উবুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে দেখি, গোরার বাচ্চারা সব মাটিতে লুটিয়ে, জন দশেক আফ্রিদী চট্‌পট্ গোরাদের রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে অন্তর্ধান। আফ্রিদীর নিশান সাক্ষাৎ যমদূতের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরখেলাপের কথাই উঠে না।

'তাই বলি, উবুড় হয়ে শুয়ে থাকতে না জানলে কখন যে কোন্ আফ্রিদীর নজরে পড়ে যাবেন বলা যায় না। জান বাঁচাবার এই হল পয়লা নম্বরের তালিম।'

আমি বললুম, 'চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেই বা দোষ কি ?

আহমদ আলী বললেন, 'উহুঁ, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবেন

www.MurchOna.com

খুদাতায়ালার আসমান—সে বড় খাবসুরৎ। কিন্তু মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কি করে? কি করে জানবেন যে ডেরা ভাঙবার সময় হল, আর এখানে শুয়ে থাকলে নয়া ফ্যাসাদ বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা? মিলিটারী আসবে, তদারক-তদন্ত হবে, আপনাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে—তার চেয়ে আফ্রিদীর গুলী ভালো।'

আমি বললুম, 'সে না হয় আমার বেলা হতে পারত। কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট দিতেই হত।'

আহমদ আলী বললেন, 'তওবা, তওবা। আমি রিপোর্ট করতে যাব কেন? আমার কি দায়? গোরার রাইফেল, আফ্রিদীর তার উপর নজর। যে-জিনিসে মানুষের জান পোঁতা, তার জন্য মানুষ জান দিতে পারে, নিতেও পারে। আমি সে ফ্যাসাদে কেন ঢুকি? বাঙালী বোমা মারে—কেন মারে খোদায় মালুম, রাইফেলে তো তার শখ নেই—ইংরেজ বোমা খেতে পছন্দ করে না কিন্তু বাঙালীর গোঁ সে খাওয়াবেই। তার জন্য সে জান দিতে কবুল, নিতেও কবুল। আমি কেন ইংরেজকে আপনার হাড়হদ্দের খবর দেব? জান লেনদেনের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের দূরে থাকা উচিত।'

আমি বললুম, 'হক কথা বলেছেন। রাসেলেরও ঐ মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না। ইংরেজ পাঠানে বিস্তর মিল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাঙালী কেন বোমা মারে সে তো অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। স্বাধীনতার জন্য। স্বধীনতা পেয়ে গেলে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাইফেলের প্রয়োজন হয়। তাই বোধ করি স্বাধীন আফ্রিদীর কাছে রাইফেল এত প্রিয়বস্তু।

আহমদ আলী অনেকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। বললেন, কি জানি স্বাধীনতা কিসের জোরে টিকে? রাইফেলের জোরে না বুকের জোরে। আমি এই পরশু দিনের একটা দাঙ্গার কথা ভাবছিলুম। জানেন বোধ হয়, পেশাওয়ারের প্রায় প্রতি পাড়ায় একজন করে গুণ্ডার সর্দার থাকে। দুই পাড়ার গুন্ডার দলে সেদিন লাগল লড়াই। গোলা-গুলির ব্যাপার নয়। হাতাহাতি, জোর ছোরাছুরি। একদল মিনিট দশেক পরে মার সইতে না পেরে দিল ছুট। কিন্তু তাদের সর্দার রইল দাঁড়িয়ে। সমস্ত দল তখন গিয়ে তার ঘাড়ে—মেরে গুঁতিয়ে থেঁৎলে যখন ভাবল সে মরে গিয়েছে, তখন তাকে ফেলে সবাই চলে গেল। কাল তাকে হাসপাতালে দেখে এলুম—অন্তত ছ'মাস লাগবে সারতে—যদি ফাঁড়াটা কাটে। ক'খানা পাঁজর ভেঙেছে, আঁতে ক'টা ফুটো হয়েছে তার হিসেব নিকেশ এখনো শেষ হয়নি।

www.MurchOna.com

পাঁচফুট হয় কি না হয়। ছোরাও নাকি সে চালাতে জানে না, রাইফেলও

কিন্তু আশ্চর্য হলুম দেখে যে লোকটা অতি রোগা টিঙটিঙে, সাড়ে সে রাখে না। ব্যস—ঐ এক চীজ আছে, হিম্মৎ। বিস্তর মার খেয়েছে, অনেকবার। মেরেছে অল্প, মারিয়েছে অনেক, পালায়নি কক্‌খনো। আসামী হয়ে আদালতে এসেছে বহুবার কখনো ফরিয়াদী হয়নি। বলে, 'পাঁচজনের বিপদ আপদের ফৈসালা করে দিই আমি, আর আমি যাব আদালতে আমার বিপদ আপদের কান্নাকাটি শোনাতে!

'আরও আশ্চর্য হলুম দেখে, হাসপাতালে তার ওয়ার্ডে যেন পেশাওয়ারের ফলের বাজার বসে গিয়েছে। কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরী, মজার-ই-শরীফের আখরোট-খোবানী সব মজুদ। ছ'জন পালোয়ান দিনরাত তার খাটের চতুর্দিকে মাটিতে বসে—কি জানি হুজুরের কখন কি দরকার হয়। হুজুর অবশ্য উপস্থিত জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সংকটসংকুল খাইবারপাসে।

'কিন্তু আসল কথা, সে এখনো দলের সর্দার। তার ইজ্জৎ বেড়েছে; তার খুশনামে পেশাওয়ারের গুন্ডা মহল গমগম করছে।'

আমি চুপ করে ভাবছি, এমন সময় দেখি আহমদ আলী মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন, 'লোকটার হিম্মত ছাড়া নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব। সব কথার চটপট উত্তর দিতে পারে। শুনলুম চারবার প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে পাঁচবারের বার যখন হাকিম ইজাজ হুসেন খানের আদালতে উপস্থিত হল, তখন তিনি নাকি চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই নিয়ে তুই পাঁচবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস; তোর লজ্জা-শরম নেই?'

'সর্দার নাকি মুচকি হেসে বলেছিল, হুজুর প্রমোশন না পেলে আমি কি করব?'

সে রাতে শুতে যাবার আগে মটরুদাকে চিঠিতে লিখলুম, 'চিৎ হয়ে শোবে না, উবুড় হয়ে শোবে। পাঠানমুল্লুকের এই আইন। শিব ঠাকুরের আপন দেশেও এই খবরটি পাঠিয়ে দিয়ো।'

## চার

যতই বলি, 'ভাই আহমদ আলী, খুদা আপনার মঙ্গল করবেন, আখেরে আপনি বেহেশ্‌তে যাবেন, আমার যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে, দিন,' আহমদ আলী ততই বলেন, 'বরাদরে আজীজে মন্‌ (হে আমার প্রিয় ভ্রাতা), ফার্সীতে প্রবাদ আছে, 'দের আয়্‌দ দুরুস্ত আয়দ্‌' অর্থাৎ

www.MurchOna.com

'যা কিছু ধীরেসুস্থে আসে তাহাই মঙ্গলদায়ক'; আরবীতেও আছে, 'অল অজল, মিনা শয়তান' অর্থাৎ কিনা 'হুড়দন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্হায় চলা'; ইংরিজীতেও আছে—'

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি এই পাঠানের চালে আমার চলবে না। শুনেছি এখান থেকে লান্ডিকোটাল যেতে তাদের পনরো দিন লাগে—বাইশ মাইল রাস্তা।'

আহমদ আলী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলেছে ?'

আমি বললুম, 'কেন, কাল রাত্তিরের দাওয়াতে, রমজান খান, সেই বাবরী-চুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।'

আহমদ আলী বললেন, রমজান খান পাঠানদের কি জানে ? তার ঠাকুরমা পাঞ্জাবী, আর সে নিজে লাহোরে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে। খাস পাঠান কখনো আটক (সিন্ধু নদ) পেরোয় না। তার লান্ডিকোটাল থেকে পেশাওয়ার পৌঁছতে অন্তত দু'মাস লাগার কথা। না হলে বুঝতে হবে লোকটা রাস্তার ইয়ার-দোস্তের বাড়ি কাটু করে এসেছে। পাঠান-মুল্লুকের রেওয়াজ প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে তেরাত্তির কাটানো, আর, সব পাঠান সব পাঠানের ভাইবেরাদর। হিসেব করে নিন।'

কাগজ পেন্সিল ছিল না। বললুম, 'রক্ষে দিন, আমার যে কন্ট্রাক্ট সই করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।'

আহমদ আলী বললেন, 'বাস্ না পেলে আমি কি করব ?'

'আপনি চেষ্টা করেছেন ?'

আহমদ আলী আমাকে হুঁশিয়ার হতে বলে জানালেন, তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর, নানা রকমের উকিল মোক্তার তাঁকে নিত্যি নিত্যি জেরা করে, আমি ও-লাইনে কাজ করে সুবিধা করতে পারব না।

তারপর বললেন, 'পেশাওয়ার ভালো করে দেখে নিন। অনেক দেখবার আছে, অনেক শেখবার আছে। বোখারা সমরকন্দ থেকে সদাগরেরা এসেছে পুস্তীন নিয়ে, তাশকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সামোভার কি ?'

'রাশান গল্প পড়েন নি ? সামোভার হচ্ছে ধাতুর পাত্র—টেবিলে রেখে তাতে চায়ের জল গরম করা হয়। আপনারা যে রকম মিঙ বংশের ভাস্ নিয়ে মাতামাতি করেন, পেশাওয়ার কান্দাহার তাশকন্দ তুল্য সামোভার নিয়ে সেই রকম গড়াগড়ি করে, কে কত দাম দিতে পারে। সে কথা আরেক দিন হবে। তারপর শুনুন, মজার-ই-শরীফ থেকে কার্পেট এসেছে, বদখশান থেকে 'লাল' রুবি, মেশেদ থেকে তসবী, আজরবাইজান থেকে—'

www.MurchOna.com

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

'আরো কত কি। তারা উঠেছে সব সরাইয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গরম ব্যবসা করে, রাত্তিরে জোর খানাপিনা, গানবাজনা। কত হৈ-হল্লা, খুনখারাবী, কত রকম-বেরকমের পাপ। শোনেননি বুঝি, পেশাওয়ার হাজার পাপের শহর। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করুন যে-কোনো সরাইয়ে—ডজনখানেক ভাষা বিনা কসরতে বিনা মেহনতে শেখা হয়ে যাবে। পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন, চট করে চলে যাবেন ফার্সীতে, তারপর জগতাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী—বাকীগুলো আপনার থেকেই হয়ে যাবে। গান-বাজনায় আপনার বুঝি শখ নেই—সে কি কথা? আপনি বাঙালী, টাগোর সাহেবের গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার আমি পড়েছি। আহা, কি উম্‌দা বয়েৎ, আমি ফার্সী তর্জমায় পড়েছি। আপনার তো এসব জিনিসে শখ থাকার কথা। নাই বা থাকল, কিন্তু ইদনজানের গান না শুনে আপনি পেশাওয়ার ছাড়বেন কি করে? পেশাওয়ারী হুরী, বারোটা ভাষায় গান গাইতে পারে। তার গাহক দিল্লী থেকে বাগদাদ অবধি। আপনি গেলে লড়কী বহুৎ খুশ হবে—তার রাজত্ব বাগদাদ থেকে বাঙাল্ অবধি ছড়িয়ে পড়বে।'

আমি আর কি করি। বললুম, 'হবে, হবে। সব হবে। কিন্তু টাগোর সাহেবের কোন্ কবিতা আপনার বিশেষ পছন্দ হয়?'

আহমদ আলী একটু ভেবে বললেন, 'আয় মাদর, শাহজাদা ইমরোজ—' বুঝলুম, এ হচ্ছে,

'ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর—'

বললুম, 'সে কি কথা, খান সাহেব? এ কবিতা তো আপনার ভালো লাগার কথা নয়। আপনারা পাঠান, আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মত রুখে দাঁড়াবেন। ঘোড়া চড়ে আসবেন বিদ্যুৎগতিতে, প্রিয়াকে একটানে তুলে নিয়ে কোলে বসিয়ে চলে যাবেন দূর-দূরান্তরে। সেখানে পর্বতগুহায় নির্জনে আরম্ভ হবে প্রথম মান-অভিমানের পালা, আপনি মাথা পেতে দেবেন তাঁর পায়ের মখমলের চটির নিচে—'

আমাকেই থামতে হল কারণ আহমদ আলী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক, কারো কথা মাঝখানে কাটেন না। আমি আটকে গেলে পর বললেন, 'থামলেন কেন, বলুন।'

আমি বললুম, 'আপনারা কোন্ দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা, মা মা করে।'

আহমদ আলী বললেন, 'হুঁ, এক জর্মন দার্শনিকও নাকি বলেছেন স্ত্রীলোকদের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না।'

www.MurchOna.com

আমি বললুম, 'তওবা তওবা, অত বাড়াবাড়ির কথা হচ্ছে না।'

আহমদ আলী বললেন, 'না দাদা, প্রেমের ব্যাপারে হয় ইস্পার না হয় উস্পার। প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা, বিস্তর লোকজন। সেখানে 'গোল্ডেন মীন' বা 'সোনালী মাঝারি' বলে কোনো উপায় নেই। হয় 'কীপ টু দি রাইট' অর্থাৎ ম্যা ম্যা করে হৃদয়বেদন নিবেদন, না হয়, 'লেফট' অর্থাৎ বজ্রমুষ্টি দিয়ে—নীটশে যা বলেছেন। কিন্তু থাক্ না এসব কথা।'

বুঝলুম প্রেমের ব্যাপারে পাঠান নীরব কর্মী। আমরা বাঙালী, দুপুররাত্রে পাড়ার লোককে না জাগিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পারিনে। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমাকে যেন খুশী করার জন্য আহমদ আলী বললেন, 'পেশাওয়ারের বাজারে কিন্তু কোনো গানেওয়ালী নাচনেওয়ালী ছ'মাসের বেশী টিকতে পারে না। কোনো ছোকরা পাঠান প্রেমে পড়বেই। তারপর বিয়ে করে আপন গাঁয়ে নিয়ে সংসার পাতে।'

'সমাজ আপত্তি করে না? মেয়েটা দুদিন বাদে শহরের জন্য কান্নাকাটি করে না?'

'সমাজ আপত্তি করবে কেন? ইসলামে তো কোনো মানা নেই। তবে দুদিন বাদে কান্নাকাটি করে কি না বলা কঠিন। পাঠান গাঁয়ের কান্না শহরে এসে পেঁছবে এত জোর গলা ইদনজানেরও নেই। জানকী বাঈয়ের থাকলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হত না। হলপ করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার নিজের বিশ্বাস, বেশীর ভাগ মেয়েই বাজারের হট্টগোলের চেয়ে গ্রামের শান্তিই পছন্দ করে। তার উপর যদি ভালোবাসা পায়, তা'হলে তো আর কথাই নেই।'

আমি বললুম, 'আমাদের এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকও ঐ ধরণের অভিমত দিয়েছেন, মেয়েদের বাজারে বহু খোঁজখবর নিয়ে।'

এমন সময় আহমদ আলীর এক বন্ধু মুহম্মদ জান বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির। আহমদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইসিকেল আবার খোঁড়া হল কি করে?'

মুহম্মদ জান পাঞ্জাবী। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি এদেশে এসেছেন বুঝতে পারিনে। এই পাঠানরা যে কি রকম পাব্লিক নুইসেন্স তার খবর জানতে পারতেন যদি একদিনও আধ ঘণ্টার তরে এ শহরে বাইসিকেল চড়তেন। এক মাইল যেতে না যেতে তিনটে পাংকচার। সব ছোট ছোট লোহার।

ভদ্রলোক দম নিচ্ছিলেন। আমি দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত লোহা আসে কোথা থেকে?'

www.MurchOna.com

মুহম্মদ জান আরো চটে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কেন শুধচ্ছেন ? জিজ্ঞেস করুন আপনার দিলজানের দোস্ত শেখ আহমদ আলী খান পাঠানকে।'

আহমদ আলী বললেন, 'জানেন তো পাঠানরা বড্ড আড্ডাবাজ। গল্প-গুজব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে যাবে রাস্তার পাশে। মুচীকে বলবে, 'দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটা কয়েক পেরেক ঠুকে।' মুচী তখন ঢিলে লোহাগুলো পিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নূতনও লাগিয়ে দেয়। এই রকম শ'খানেক লোহা লাগালে জুতোর চামড়া আর মাটিতে লাগে না, লোহার উপর দিয়েই রাস্তার পাথরের চোট যায়। হাফসোল লাগানোর খরচাকে পাঠান বড্ড ভয় করে কিনা। সেই পেরেক আবার হরেক রকম সাইজের-হয়। পাঠানের জুতো তাই লোহার মোজায়িক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না-ঠোকানো অবান্তর—মুচীর সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ঐ তার অজুহাত।'

মুহম্মদ জান বললেন, 'আর সেই লোহা ঢিলে হয়ে গিয়ে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।'

আমি বললুম, 'এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল আড্ডা মানুষকে অপকর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছি।'

আহমদ আলী কাতরস্বরে বললেন, 'আড্ডার নিন্দা করবেন না। বাইসিকেল চড়ার নিন্দা করুন। আপনাকে বলিনি, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা ? তাই তো বাইসিকেলের আরেক নাম শয়তানের গাড়ী।'

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাওয়ার দিনের ১১৪ ডিগ্রী ভুলে গিয়ে মোলায়েম বাতাস দিয়ে সর্বাঙ্গের গ্লানি খেদ ঘুচিয়ে দেয়। রাস্তাঘাট যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাই তুলে ঘোড়ার গাড়ির খটখটানি দিয়ে তুড়ি দিতে থাকে। পাঠান বাবুরা তখন সাজগোজ করে হাওয়া খেতে বেরোন। পায়ে জরীর পয়জার, পরনে পপলিনের শিলওয়ার—তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মত ক্রীজের দুদিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে; মুড়ির ভিতরে লাল সুতোর গোলাপী আভা। গায়ে রঙীন সিল্কের লম্বা শার্ট আর মাথায় যে পাগড়ি তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরাভরণের সঙ্গে হয় না। বাঙালীর শিরাভরণ দেখে অভ্যাস নেই; টুপি বলুন, হ্যাট বলুন, সবই যেন তার কাছে অবান্তর ঠেকে, মনে হয় বাইরের থেকে জোর করে চাপানো, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠানের পাগড়ি দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাথাটা দিয়েছেন নিতান্ত ঐ পাগড়ি জড়াবার উপলক্ষ্য হিসাবে।

www.MurchOna.com

কামিয়ে-জুমিয়ে গোঁফে আতর মেখে আর সেই ভুবনমোহন পাগড়ি বেঁধে খানসাহেব যখন সাঁঝের ঝোঁকে পেশাওয়ারের রাস্তায় বেরোন, তখন কে বলবে তিনি জাকারিয়া স্ট্রীটের পাঠানের জাত ভাই; কোথায় লাগে তাঁর কাছে তখন হলিউডের ঈভনিঙ ড্রেসপরা হী মেনদের দল ?

ফুরফুরে হাওয়া গাছের মাথায় চিরুনি চালিয়ে, খানসায়েবদের পাগড়ির চুড়ো দুলিয়ে, ফুলের দোকানে ঝোলানো মালাতে কাঁপন লাগিয়ে আর সর্বশেষে আহমদ আলীর দু'কান-ছোঁয়া গোঁফে হাত বুলিয়ে নামল আমার শ্রান্ত ভালে—তপ্ত গ্রীষ্মের দগ্ধ দিনান্তের সন্ধ্যাকালে। এ যেন বাঙলা দেশের জ্যৈষ্ঠশেষের নববর্ষণ—শীতল জলধারার পরিবর্তে এ যেন মাতৃহস্তের স্নিগ্ধমন্দ মলয়ব্যজন। কোন্ এক নৃশংস ফারাওয়ের অত্যাচারে দিবাভাগে দেশের জনমানব প্রাণীপতঙ্গ দলে দলে ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়ে প্রহর গুণছিল, পশ্চিম-পিরামিডে তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাতাস যেন মোজেসের অভয়বাণী দিয়ে গেল—দিকে দিকে নতুন প্রাণের সাড়া—ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

কিন্তু জেগে উঠেই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন কি আহারের ? রুটি আর কাবাবওয়ালার দোকানের সামনে কী অসম্ভব ভীড়। বোরকাপরা মেয়ে, সবে হাঁটতে শিখেছে ছেলে, বাঁ-হাত মরণের-দিকে-ডান-হাত রুটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে বুড়ো, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহারের সন্ধানে। রুটিওয়ালা সেই ক্ষুধার্তদের শান্ত করার জন্য কাউকে কাতর-কন্ঠে ডাকে 'ভাই', কাউকে 'বেরাদর', কাউকে 'জানে মন্' (আমার জান্), কাউকে 'আগা-জান্'—পশতু, পাঞ্জাবী, ফারসী, উর্দু চারটে ভাষায় সে একসঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। ওদিকে তন্দুরের ভিতর লম্বা লোহার আঁকশি চালিয়ে রুটি টেনে টেনে ওঠাচ্ছে রুটিওয়ালার ছোকরারা। গন-গনে আগুনের টকটকে লাল আভা পড়েছে তাদের কপালে গালে। বড় বড় বাবরীচুলের জুলফি থেকে থেকে চোখমুখ ঢেকে ফেলছে—দুহাত দিয়ে রুটি তুলছে, সরাসরি ফুরসুৎ নেই। বুড়ো রুটিওয়ালার দাড়ি হাওয়ায় দুলছে, কাজের হিড়িকে তার বজ্রবাঁধন পাগড়ি পর্যন্ত টেরচা হয়ে একদিকে নেমে এসেছে—ছোকরাদের কখনও তম্বী করে 'জুদ্ কুন্,' 'জলদি করো, জলদি করো,' খদ্দেরদের কখনও কাকুতি-মিনতি 'হে ভ্রাতঃ, হে বন্ধু, হে আমার প্রাণ, হে আমার দিলজান, সবুর করো, সবুর করো, তাজা গরম রুটি দি বলেই তো এত হাঙ্গাম-হুজ্জৎ। বাসী দিলে কি এতক্ষণ তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখতুম ?'

বোরকার আড়াল থেকে কে যেন বলল—বয়স বোঝার জো নেই—'তোর তাজা রুটি খেয়ে খেয়েই তো পাড়ার তিন পুরুষ মরল। তুমি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে বাসী খাস। তাই দে না।'

www.MurchOna.com

বোরকা পরে, ঐ যা। তা না হলে পাঠান মেয়েও সবাধীন।

রুটির পর ফুল কিংবা আতর। মনে পড়ল মহাপুরুষ মুহম্মদের একটি বচন—সত্যেন দত্তের তর্জমা—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
জুটে যায় যদি দুইটি পয়সা
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

## পাঁচ

পাঠান অত্যন্ত অলস এবং আড্ডাবাজ, কিন্তু আরামপ্রয়াসী নয় এবং যেটুকু সামান্য তার বিলাস, তার খরচাও ভয়ঙ্কর বেশী কিছু নয়। দেশভ্রমণকারী গুণীদের মুখে শোনা যে, যাদের গায়ের জোর যেমন বেশী, তাদের সবভাবও হয় তেমনি শান্ত। পাঠানদের বেলায়ও দেখলুম কথাটা খাঁটি। কাগজে আমরা হামেশাই পাঠানদের লুটতরাজের কথা পড়ি—তার কারণও আছে। অনুর্বর দেশ, ব্যবসাবাণিজ্য করতে জানে না, পল্টনে তো আর তামাম দেশটা ঢুকতে পারে না, কাজেই লুটতরাজ ছাড়া অন্য উপায় কোথায়? কিন্তু পেটের দায়ে যে অপকর্ম সে করে, মেজাজ দেখাবার জন্য তা করে না। তার আসল কারণ অবশ্য পাঠানের মেজাজ সহজে গরম হয় না—পাঞ্জাবীদের কথা সতন্ত্র—এবং হলেও সে চট করে বন্দুকের সন্ধান করে না। তবে সব জিনিসেরই দুটো ব্যত্যয় আছে—পাঠান তো আর খুদ খুদাতালার আপন হাতে বানানো ফিরিস্তা নয়। বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবার পাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর ভাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শান্তমনে যোগাসনে বসে আঙুল গোনে, নিদেনপক্ষে তাকে ক'টা খুন করতে হবে। কিন্তু হিসেব-নিকেশে সাক্ষাৎ বিদ্যেসাগর বলে প্রায়ই ভুল হয় আর দুটো-চারটে লোক বেঘোরে প্রাণ দেয়। তাই নিয়ে তদ্বীশ্বা করলে পাঠান সকাতর নিবেদন করে, 'কিন্তু আমার যে চার-চারটে বুলেটের বাজে খরচা হল তার কি? তাদের গুষ্ঠি-কুটুম কান্নাকাটি করছে, কিন্তু একজনও একবারের তরে আমার বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না। ইনসান বড়ই খুদ-পরস্ত—সংসার বড়ই স্বার্থপর।'

পরশু রাতের দাওয়াতে এ রকম নানা গল্প শুনলুম। এসব গল্প

www.MurchOna.com

বলার অধিকার নিমন্ত্রিত ও রবাহূতদের ছিল। একটা জিনিসে বুঝতে পারলুম যে, এঁদের সক্কলেই খাঁটি পাঠান।

সে হল তাদের খাবার কায়দা। কার্পেটের উপর চওড়ায় দুহাত, লম্বায় বিশ-ত্রিশহাত—প্রয়োজন মত—একখানা কাপড় বিছিয়ে দেয়। সেই দস্তরখানের দুদিকে সারি বেঁধে এক সারি অন্য সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তারপর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়; তিন থালা আলু-গোস্ত, তিন থালা শিক-কাবাব, তিন থালা মুর্গি রোস্ট, তিন থালা সিনা-কলিজা, তিন থালা পোলাও, এই রকম ধারা সব জিনিস একখানা দস্তরখানের মাঝখানে, দুখানা দুই প্রান্তে। বাঙালী আপন আপন থালা নিয়ে বসে; রান্নাঘরের সব জিনিসই কিছু না কিছু পায়। পাঠানদের বেলা তা নয়। যার সামনে যা পড়ল, তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট। প্রাণ গেলেও কেউ কখনো বলবে না, আমাকে একটু মুর্গি এগিয়ে দাও, কিম্বা আমার শিক-কাবাব খাবার বাসনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি হঠাৎ কেউ দরদ দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আরে হোথায় দেখো গোলাম মুহম্মদ ঢ্যাঁড়শ চিবোচ্ছে, ওকে একটু পোলাও এগিয়ে দাও না'—সবাই তখন হাঁ-হাঁ করে সব ক'টা পোলাওয়ের থালা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর মজলিস গালগল্পে ফের মশগুল। ওদিকে গোলাম মুহম্মদ শুকনো পোলাওয়ের মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মারা গেল, না মাংসের থৈ-থৈ ঝোলে ডুবে গিয়ে প্রাণ দিল, তার খবর ঘন্টা-খানেক ধরে আর কেউ রাখে না। এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, পাঠান আড্ডা জমাবার খাতিরে অনেক রকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। গল্পের নেশায় বে-খেয়ালে অন্ততঃ আধ ডজন অতিথি সুদ্ধু শুকনো রুটি চিবিয়েই যাচ্ছে, চিবিয়েই যাচ্ছে। অবচেতন ভাবটা এই, পোলাও-মাংস বাছতে হয়, দেখতে হয়, বহুৎ বয়নাক্কা, তাহলে লোকের মুখের দিকে তাকাব কি করে, আর না তাকালে গল্প জমবেই বা কি করে।

অথচ এঁরা সবাই ভদ্রসন্তান, দু'পয়সা কামায়ও বটে। বাড়িতে নিশ্চয়ই পছন্দ মাফিক পোলাও-কালিয়া খায়। কিন্তু পাঠান জীবনের প্রধান আইন, একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেয়ে ইয়ারবক্সীর সঙ্গে শুকনো রুটি চিবনো ভালো। ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তব, মরি
তোমারে ছাড়িয়ে মসজিদে গিয়া
কী হবে মন্ত্র স্মরি ?

www.MurchOna.com

কিন্ত ওমর বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠান ভাঙ ভাঙ উর্দুতে ঐ একই আপ্তবাক্য প্রলেতারিয়া কায়দায় জানায়—

'দোস্ত !
তুমাহারী রোটি, হমারা গোস্ত !'

অর্থাৎ 'নেমন্তন্ন করেছে সেই আমার পরম সৌভাগ্য। শুধু শুকনো রুটি ? কুছ পরোয়া নাহী। আমি আমার মাংস কেটে দেব।

কাব্যজগতে যে হাওয়া বইছে, তাতে মনে হয়, ওমরের শরাবের চেয়ে মজুরের ধেনোর কদর বেশী।

তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতরে বুর্জুয়া-প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। অনুভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিন্তাধারায় যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশী, কেউ কম। কেউ সেক্সপীয়র পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালমন্দ বিচার করার সময় দুই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে এখনো তারা গুষ্ঠির ঐতিহ্যগত সনাতন জান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে।

এসব তত্ত্ব আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরে নানা রঙ, নানা দাগ কেটে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করে বললেন—

'এই ধরুন আমার সহকর্মী অধ্যাপক খুদাবখ্শের কথা। ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত। ইহসংসারে সবকিছু তিনি অর্থনীতি দিয়ে জলের মত তরল করে এই তৃষ্ণার দেশে অহরহ ছেলেদের গলায় ঢালছেন। ধর্ম পর্যন্ত বাদ দেন না। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর ধর্ম আরম্ভ করেছিলেন ধনের নবীন ভাগবন্টন পদ্ধতি নির্মাণ করে; তাতে লাভ হওয়ার কথা গরীবেরই বেশী—তাই সবচেয়ে দুঃখী জেলেরা এসে জুটেছিল তাঁর চতুর্দিকে। মহাপুরুষ মুহম্মদও নাকি সুদ তুলে দিয়ে অর্থবন্টনের জমিকে আরবের মরুভূমির মত সমতল করে দিয়েছিলেন। এসব তো ইহলোকের কথা—পরলোক পর্যন্ত খুদাবখ্শ অর্থনৈতিক র‍্যাদা চালিয়ে চিক্কন মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু থাক এসব কচকচানি—মোদ্দা কথা হচ্ছে ভদ্রলোক ইতিহাসের দূরবীনে আপন চোখটি এমনি চেপে ধরে আছেন যে অন্য কিছু তাঁর নজরে পড়ে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সকলের মনে গভীর সন্দেহ ছিল।

'মাসখানেক পূর্বে তাঁর বড় ছেলে মারা গেল। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ত, মেধাবী ছেলে, বাপেরই মত পড়াশুনায় মশগুল থাকত। বড় ছেলে মারা গিয়েছে, চোট লাগার কথা, কিন্তু খুদাবখশ নির্বিকার। সময়মত কলেজে

www.MurchOna.com

হাজিরা দিলেন। চায়ের সময় আমরা সন্তর্পণে শোক নিবেদন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ লেকচর শুনলুম, জরথুস্ত্র কোন অর্থনৈতিক কারণে রাজা গুশ্‌ৎআসপ্‌কে তাঁর নূতন ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিন দিন বাদে দুসরা ছেলে টাইফয়েডে মারা গেল—খুদাবখ্‌শ বৌদ্ধ ধর্মের কি এক পিটক, না খোদায় মালুম কি, তাই নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এক মাস যেতে না যেতে স্ত্রী মারা গেলেন পিত্রালয়ে—খুদাবখ্‌শ তখন সিন্ধুর পারে পারে সিকন্দর শাহের বিজয়পন্থার অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে নাক-কান বন্ধ করে তুরীয়ভাব অবলম্বন করেছেন।

'আমরা ততদিনে খুদাবখ্‌শের আশা ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা ইতিহাস করে করে অমানুষ হয়ে গিয়েছে এই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর পাঠানসমাজ যখন মনুষ্যজাতির সর্বোচ্চ গৌরবস্থল তখন আর কি সন্দেহ যে খুদাবখ্‌শের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পূর হয়ে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক টেলিস্কোপের পাল্লারও বহু ঊর্ধ্বে দূর-দূরান্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত কোন্ সূক্ষ্মলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'এমন সময় মারা গেল তাঁর ছোট ভাই—পল্টনে কাজ করত। খুদা-বখ্‌শের আর কলেজে পাত্তা নেই। আমরা সবাই ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি এক প্রাগৈতিহাসিক ছেঁড়া গালচের উপর খুদাবখ্‌শ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। পুঁথিপত্র, ম্যাপ, কম্পাস চতুর্দিকে ছড়ানো। গড়াগড়িতে চশমার একটা পরকলা ভেঙ্গে গিয়েছে। খুদাবখ্‌শের বুড়া মামা বললেন, দু'দিন ধরে জল স্পর্শ করেননি।

'হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।' শোকে যে মানুষ এমন বিকল হতে পারে পূর্বে আর কখনো দেখিনি। আমরা সবাই নানা রকমের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু খুদাবখ্‌শের মুখে ঐ এক কথা, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

'শেষটায় থাকতে না পেরে আমি বললুম, 'আপনি পণ্ডিত মানুষ, শোকে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আর আপনার সহ্য করবার ক্ষমতা যে কত অগাধ সে তো আমরা সবাই দেখেছি—দুটি ছেলে, স্ত্রী মারা গেলেন, আপনাকে তো এতটুকু কাতর হতে দেখিনি।'

'খুদাবখ্‌শ আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু মুখে কথা ফুটল। বললেন, 'আপনি পর্যন্ত এই কথা বললেন? ছেলে মরেছিল তো কি? আবার ছেলে হবে। বিবি মরেছেন তো কি? নূতন শাদী করব। কিন্তু ভাই পাব কোথায়? তারপর আবার হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

www.MurchOna.com

অধ্যাপক বলা শেষ করলে আমি বললুম, 'লক্ষ্মণের মৃত্যুশোকে রামচন্দ্রও ঐ বিলাপ করেছিলেন।'

আহমদ আলী বললেন, 'লছ্‌ মন ? রামচন্দরজী ? হিন্দুদের কি একটা গল্প আছে না ? সেইটে আমাদের শুনিয়ে দিন। আপনি কখনো গল্প বলেন না, শুধু শোনেনই।'

ইয়া আল্লা ! আদি কবি বাল্মীকি যে গল্প বলেছেন আমাকে সে গল্প নূতন করে আমার টোটাফুটা উর্দু দিয়ে বলতে হবে ! নিবেদন করলুম, 'অধ্যাপক খুদাবখ্‌শকে অনুরোধ করবেন। রামায়ণের নাকি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।'

অধ্যাপক শুধালেন, কিন্তু রামচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন, নয় কি ?

আমি বললুম, 'আলবৎ।'

অধ্যাপক বললেন, 'ঐ তো হল আসল তত্ত্বকথা। বীরপুরুষ আর বীরের জাতমাত্রই ভাইকে অত্যন্ত গভীর ভাবে ভালবাসে। পাঠানদের মত বীরের জাত কোথায় পাবেন বলুন ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অধ্যাপক খুদাবখ্‌শ তো বীর পুরুষ ছিলেন না।'

অধ্যাপক পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললেন, 'সে তো গুহ্যতর তত্ত্ব। অধ্যাপকি করো আর যাই করো, পাঠানত্ব যাবে কোত্থেকে ? অর্থনৈতিক কারণ-ফারণ সব কিছুই অত্যন্ত পাতলা ফিলিম—একটু খোঁচা লাগলেই আসল পেলেট্‌ বেরিয়ে পড়ে।'

মেজর মুহম্মদ খান বললেন, 'ভাইকে ভালবাসার জন্য পাঠান হওয়ার কি প্রয়োজন ? ইউসুফও (জোসেফ) তো বেনয়ামিনকে (বেনজামিন) ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন।'

অধ্যাপক বললেন, 'ইহুদিদের কথা বাদ দিন। আদমের এক ছেলে আরেক ছেলেকে খুন করেনি ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পাঠানরা ইহুদিদের হারিয়ে-যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয় ? কোথায় যেন ঐ রকম একটা থিয়োরী শুনেছি যে সেই উপজাতি যখন দেখল তাদের কপালে শুকনো, মরা আফগানিস্থান পড়েছে তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল—অর্থাৎ ফারসীতে যাকে বলে "ফগান" করেছিল—তাই তো তাদের নাম "আফগান"। আর আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন।'

www.MurchOna.com

অধ্যাপক পণ্ডিতের হাসি হেসে বললেন, 'ত্রিশ বৎসর আগে এ কথা বললে আপনাকে আমরা সাবাসী দিতুম, এখন ওসব বদলে গিয়েছে। তখনো আমরা জানতুম না যে, দুনিয়ার বড় বড় জাতেরা নিজেদের 'আর্য' বলে গৌরব অনুভব করছে। তখনো রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে বাইবেলের ইহুদি চিড়িয়াখানায় কোনো না কোনো খাঁচায় সিংহ বাঁদর কিছু না কিছু একটা হতেই হবে। এখন সে সব দিন গিয়েছে—এখন আমরা সবাই 'আর্য।' বেদফেদ কি সব আছে না?—সেগুলো সব আমরাই আউড়েছি। সিকন্দর শাহকে লড়াইয়ে আমরাই হারিয়েছি আর গান্ধার ভাস্কর্য আমাদেরই কাঁচা বয়সের হাত মক্কোর নমুনা। 'গান্ধার' আর 'কান্দাহার একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' অক্ষর নেই বলে আরব ভৌগোলিকেরা 'ক' ব্যবহার করেছেন।

পাণ্ডিত্যের অগাধ সাগরে তখন আমার প্রাণ যায় যায়। কিন্তু বিপদ-আপদে মুসকিল-আসান হামেশাই পুলিশ। আহমদ আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসরের ওসব কথা গায়ে মাখবেন না। ইসলামিয়া কলেজের চায়ের ঘরে যে আড্ডা জমে তারি খানিকটে পেতলে নিয়ে তিনি সুন্দর ভাষায় রঙীন গেলাসে আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আসল পাঠান এসব জিনিস নিয়ে কক্‌খনো মাথা ঘামিয়ে পাগড়ির প্যাঁচ ঢিলে করে না। আফ্রিদী ভাবে, আফ্রিদী হল দুনিয়ার সেরা জাত; মোমন্দ বলে বাজে কথা, খুদাতালার খাস পেয়ারা কোনো জাত যদি দুনিয়ায় থাকে তবে সে হচ্ছে মোমন্দ জাত। এমন কি তারা নিজেদের আফগান বলেও স্বীকার করে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্থানের অংশ হতে চান না? ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে স্বাধীন পাঠান হয়ে থাকবেন বলে?'

সব পাঠান এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'আলবৎ না; আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব—সে মুল্লুকের নাম হবে পাঠানমুল্লুক।'

অধ্যাপক বললেন, 'পাঠানের গোপবন্ধু লেকচার শোনেননি বুঝি কখনো। সে বলে, 'ভাই পাঠানসব. এস আমরা সব উড়িয়ে দি; ডিমোক্রেসি, অটোক্রেসি, বুরোক্রেসি, কমুনিজম, ডিকটেটরশিপ—সব সব। আরেক পাঠান তখন চেঁচিয়ে বলল, 'তুই বুঝি অ্যানার্কিস্ট?' পাঠান বলল, 'না, আমরা অ্যানার্কিও উড়িয়ে দেব।'

অধ্যাপক বললেন,' বুঝতে পেরেছেন?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর 'না' হয়ে যাবে।' এই তো?'

www.MurchOna.com

অধ্যাপক বললেন, 'ঠিক ধরেছেন!'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষের অংশ যখন হবেন না, তখন দয়া করে রাশানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন!'

সবাই সমস্বরে বললেন, 'আলবৎ!'

## ছয়

পৃথিবীর আর সব দেশে যেতে হলে একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করে যে কোনো বন্দরে গিয়ে হাজির হলেই হল। আফগানিস্থান যেতে হলে সেটি হবার যো নেই। পেশাওয়ার পৌঁছে আবার নূতন স্ট্যাম্পের প্রয়োজন। সে-ও আবার তিন দিন পরে নাকচ হয়ে যায়। খাইবার পাসের আশেপাশে কখন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যায় তার স্থিরতা নেই বলেই এই বন্দোবস্ত। আবার এই তিন দিনের মিয়াদি স্ট্যাম্প সত্ত্বেও হয়ত খাইবারের মুখ থেকে মোটর ফিরিয়ে দিতে পারে—যদি ইতিমধ্যে কোনো বখেড়া লেগে গিয়ে থাকে।

সেই স্ট্যাম্প নিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখি হরেক রকম বিদেশী লোকে ভর্তি কতকগুলো বাস্, পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'এগুলো কাবুল যায় না।' তারপর অন্য কথা পাড়বার জন্য বললেন, 'বাঙলা দেশের একটা গল্প বলুন না।'

আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা তবে শোন। বাইরে বললুম, 'গল্প বলা আমার আসে না, তবে একটা জিনিসে পাঠানে বাঙালীতে মিল দেখতে পেয়েছি সেইটে আপনাকে বলছি, শুনুন—

'এখানে যে রকম সব কারবার পাঞ্জাবী আর শিখদের হাতে, কলকাতায়ও কারবার বেশীর ভাগ অ-বাঙালীর হাতে। আর বাঙালী যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আজব।

'আমি তখন ইলিয়ট রোডে থাকতুম, সেখানে দোকানপাট ফিরিঙ্গীদের। মুসলমানদের কিছু কিছু দর্জীর দোকান আর লন্ড্রি, ব্যস্। তার মাঝখানে এক বাঙালী মুসলমান ঝাঁ-চকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল। লোকটির বেশভূষা দেখে মনে হল, শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে। স্থির করলুম, সাহস করে দোকান যখন খুলেছে তখন তাকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'জোর গরম পড়েছে—বেলা দুটো। শহরে চকিবাজীর মত ঘুরতে

www.MurchOna.com

হয়েছে—দেদার সাবান চোখে পড়েছে কিন্তু কিনিনি—ভদ্রলোকের ছেলেকে পেট্রনাইজ করতে হবে।'

'ট্রাম থেকে নেমে দোকানের সামনে এসে দেখি ভদ্রলোক নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, পাখিটা খাঁচায় ঘুমচ্ছে, ঘড়িটা পর্যন্ত সেই যে বারোটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখনো জাগেনি।'

'আমি মোলায়েম সুরে বললুম, 'ও মশাই, মশাই।'

'ফের ডাকলুম, 'ও সায়েব, সায়েব।'

'কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেজায় গরম, আমারও মেজাজ একটু একটু উষ্ণ হতে আরম্ভ করেছে। এবারে চেঁচিয়ে বললুম, 'ও মশাই, ও সায়েব।'

'ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বোয়াল মাছের মত দুই রাঙা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন, 'আজ্ঞে?' তারপর ফের চোখ বন্ধ করলেন।

'আমি বললুম, 'সাবান আছে? পামওলিভ সাবান?'

'চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন 'না'।'

'আমি বললুম, 'সে কি কথা, ঐ তো রয়েছে শো-কেসে।'

'ও বিক্‌কিরির না'।—'

তারপর আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পাঠানরাও বুঝি এই রকম ব্যবসা করে?' তিনি তো খুব খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলুন তো?'

আমি উত্তর দিলুম, 'ঐ যে বললেন, এসব বাস্‌ কাবুল যায় না।'

এবার আহমদ আলী থমকে দাঁড়ালেন। দেয়ালের দিকে ঘুরে, কোমরে দু'হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। সে তো হাসি নয়—হাসির ধমক। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন তাঁর হাসি থামবে। উত্তর দিলেন ভালো। বললেন, 'এসব বাস্‌ খাইবারপাস অবধি গিয়েই ব্যস্‌!'

আমি শুধালুম, 'এই সামান্য রসিকতায় আপনি এত প্রচুর হাসতে পারেন কি করে?'

'কেন পারব না? হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ-দিলে। আপনাকে বলিনি স্বাধীনতা কোথায় বাসা বেঁধে থাকে? রাইফেলে নয়, বুকের খুনে। একটা গল্প শুনবেন? ঐ দেখছেন, হোথায় চায়ের দোকানী বটতলায় বেঞ্চি পেতে দিয়েছে। চলুন না।'

পাঠান মাত্রই মারাত্মক ডিমোক্র্যাট। নির্জলা টাঙাওয়ালা। বিড়ি-ওয়ালার চায়ের দোকান।

আহমদ আলী তাঁর বিশাল বপুখানার ওজন সম্বন্ধে সচেতন বলে খুঁটির উপর ভর দিয়ে বসলেন, আমি আমার তনুখানা যেখানে খুশী রাখলুম। বললেন—

www.MurchOna.com

'ওমর খৈয়ামের এক রাত্রে বড্ড নেশা পেয়েছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচখানা রুবাইয়াৎ শেষ না করে উঠবেন না। জানেন তো কি রকম ঠাসবুনুনির কবিতা—শেষ করতে করতে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। মদের দোকানে যখন পেঁছিলেন তখন ভোর হব হব। হুংকার দিয়ে বললেন, 'নিয়ে এস তো হে, এক পাত্তর উৎকৃষ্ট শিরাজী!' মদওয়ালা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'হুজুর এত দেরিতে এসেছেন, রাত কাবারের সঙ্গে সঙ্গে মদও কাবার হয়ে গিয়েছে।' ওমর নরম হয়ে বললেন, 'শিরাজী নেই তো অন্য কোনো মাল দাও না।' মদওয়ালা বলল, 'শরম কী বাৎ। কিচ্ছু নেই হুজুর।' ওমর বললেন, 'পরোয়া নদারদ, ঐ যে সব এঁটো পেয়ালাগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে সেগুলো ধুয়ে তাই দাও দিকিনি—নেশার জিম্মাদারি আমার।'

হিম্মতের জিম্মাদারি, হাসির জিম্মাদারি, নেশার জিম্মাদারি কিসে, কার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বেই দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই ভেজাল পাঠান—তাঁর রাত্য-দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন—রমজান খান। আমি আহমদ আলীকে আঙুল দিয়ে দেখালুম। আর যায় কোথায়? 'ও রমজান খান, জানে মন্, বরাদরে মন্, এদিকে এসো।' আমাকে তম্বী করে বললেন, 'আশ্চর্য লোক, আমি না ডাকলে আপনি ও'কে যেতে দিতেন? এই গরমে? লোকটা সর্দি-গর্মি হয়ে মারা যেত না? আল্লা রসুলের ডর-ভয় নেই?'

রমজান খান এসে বললেন, 'ভগিনীপতির অসুখ, তার করতে যাচ্ছি।' বলে ঝুপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। আহমদ আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হবে, হবে, সব হবে। টেলিগ্রাফের তার শক্ত মালে তৈরী—দু'চার ঘন্টায় ক্ষয়ে যাবে না। সুখবর শোনো। সৈয়দ সাহেব একখানা বহুৎ উম্‌দা গল্প পেশ করেছেন।' বলে তিনি আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টমাটো-রস আর উস্টার সস্ ঢেলে রমজান খানকে পরিবেশন করলেন। বারে বারে বলেন, ও সাবান বিক্‌কিরির না—এ বাস্ কাবুল যায় না। এ যেন বাঙলা দেশের পূর্ব আকাশে সূর্যোদয় আর পেশাওয়ারের পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেল। হুবহু একই রঙ।'

রমজান খান বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু বাঙালী আর পাঠানে একটা জায়গায় সখ্‌ৎ গরমিল আছে।'

আমি শুধালুম, 'কিসে?'

রমজান খান বললেন, 'আমি সিন্ধুনদ পেরিয়ে আহমদ আলীর পাক নজরে যে মহাপাপ করেছি এটা সেই সিন্ধুপারের কাহিনী। তবে আটকের কাছে নয়, অনেক দক্ষিণে—সেখানে সিন্ধু বেশ চওড়া। তারি

www.MurchOna.com

বালুচরে বসে দুপুর রোদে আটজন পাঠান ঘামছে। উট ভাড়া দিয়ে তারা ছিয়ানব্বুই টাকা পেয়েছে, কিন্তু কিছুতেই সমানেসমান ভাগ বাঁটোয়ারা করতে পারছে না। কখনো কারো হিস্যায় কম পড়ে যায়, কখনো কিছু টাকা উপরি থেকে যায়। ক্রমাগত নূতন করে ভাগ হচ্ছে, হিসেব মিলছে না, ঘাম ঝরছে আর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গলা ও চড়ছে। এমন সময় তারা দেখতে পেল, অন্য পার দিয়ে এক বেনে তার পুটুলি হাতে করে যাচ্ছে। সব পাঠান এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বেনেকে ডাকল, এপারে এসে তাদের টাকার ফৈশালা করে দিয়ে যেতে। বেনে হাত-পা নেড়ে বোঝালো অত মেহন্নত তার সইবে না, আর কত টাকা ক'জন লোক তাই জানতে চাইল। চার কুড়ি দশ ও তার উপরে ছয় টাকা আর হিস্যেদার আটজন। বেনে বলল, 'বারো টাকা করে নাও।' পাঠানরা চেঁচিয়ে বলল, 'তুই একটু সবুর কর, আমরা দেখে নিচ্ছ। বখরা ঠিক ঠিক মেলে কিনা।' মিলে গেল— সবাই অবাক। তখন তাদের সর্দার চোখ পাকিয়ে বলল, 'এতক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলুম, হিসেব মিলল না; এখন মিলল কি করে? ব্যাটা নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে হিসেব মিলিয়ে দিয়েছে। ওপার থেকে সে যখন হিসেব মেলাতে পারে তখন নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরাতেও পারে। পাকড়ো শালাকো!'

রমজান খান বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, পরোপকার করতে গিয়ে বেনের পো'র অবস্থা। ভাগ্যিস সিন্ধু সেখানে চওড়া এবং বেনেরা আর কিছু পারুক না-পারুক ছুটতে পারে আরবী ঘোড়ার চেয়েও তেজে। সে-যাত্রা বেনে বেঁচে গেল।'

আমি বললুম, 'গল্পটি উপাদেয়, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে মিল-গরমিলের এতে আছে কোন্ চীজ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী আপন দেশে ব'সে, এভারেস্টের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে, চূড়োয় চড়তে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাৎলে দেয়নি, ঐ দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়?'

আমি বললুম, 'হাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।'

আহমদ আলী শুধালেন, 'তাই বুঝি বাঙালী চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকে বললুম, 'সেও একটা অতি সূক্ষ্ম কারণ বটে, তবে' কিনা শিকদার এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারেননি।'

রমজান খান উষ্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, 'হুঁ, কিন্তু একটু সামান্য টেকনিকল মুশকিল ছিল। নামকরণ যখন হয় শিকদার তখন কলকাতায় আর মহামান্য স্যার জর্জ লন্ডনে পেনসন টানছেন। পাল্লাটা—'

www.MurchOna.com

পুরো পাঠান এবং নিমপাঠান এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শুধালেন, 'তার মানে ? তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্ট মাপা হয়নি ?'

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন ? এই আপনাদের ভাইবেরাদরই কতবার কাবুল দখল করেছেন আমার ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু এই কথাটা মনে গাঁথা আছে যে, নাম হয়েছে প্রতিবারেই ইংরেজের। আর আপনারা যখনই হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তখনই হয় ইংরেজ কচুকাটা হয়ে মরেছে, নয় আপনাদের বদনাম দিয়ে নিজের অপমান জ্বালার মত মোটা মোটা মেডেল পরে ঢেকেছে। এই গেলবারে যখন দু'খানা আকবরশাহী কামান আর তিনখানা জাহাঙ্গিরী বন্দুক দিয়ে আমানউল্লা ইংরেজকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন, তখন ইংরেজ তামাম দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে শোনায়নি যে, পাঠানের ফেরেব্বাজিতেই তারা লড়াই হারল ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী এত খবর রাখে কেন ?'

আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে না করেন, আর গোস্তাকি বেয়াদবি মাফ করেন, তবে সবিনয় নিবেদন, আপনারা যদি একটু বেশী খবর রাখেন তা হলে আমরা নিষ্কৃতি পাই।'

দু'জনেই চুপ করে শুনলেন। তারপর আহমদ আলী বললেন, সৈয়দ সাহেব, কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোমা মারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন চালান, ইংরেজ আপনাদের ভয়ও করে। এসব তো আরম্ভ হয়েছে মাত্র সেদিন। কিন্তু বলুন তো, যেদিন দুনিয়ার কেউ জানত না ফ্রন্টিয়ার বলে এক ফালি পাথরভর্তি শুকনো জমিতে একদল পাহাড়ী থাকে সেদিন ইংরেজ তাদের মেরে শেষ করে দিত না, যদি পারত ? ফসল ফলে না, মাটি খুঁড়লে সোনা চাঁদি কয়লা তেল কিছুই বেরোয় না, এক ফোঁটা জলের জন্য ভোর হবার তিন ঘন্টা আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্খ পাঠান, কত যুগ ধরে, কত শতাব্দী ধরে কে জানে ? সিন্ধুর ওপারে যখন বর্ষার বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তখন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি ? পুরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া অদ্ভুত মিঠে মিঠে গন্ধ নিয়ে আসে, আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুব দেশে চলে গিয়েছে—যায়নি শুধু মূর্খ আফ্রিদী মোমন্দ।

'লড়াই করে যখন ইংরেজ এদেশকে উচ্ছন্ন করতে পারল না তখন সে প্রলোভন দেখায়নি ? লাখ লাখ লোক পল্টনে ঢুকল। ইংরেজের ঝান্ডা এদেশে উড়ল বটে, কিন্তু তার রাজত্ব ঐ ঝান্ডা যতদূর থেকে দেখা যায়

www.MurchOna.com

তার চেয়েও কম। আর পল্টনে না ঢুকে পাঠান করতই বা কি ? পাঠান-মোগল আমলে তাদের ভাবনা ছিল না। পল্টনের দরওয়াজা খোলা, অথচ মোগলপাঠান এই গরীব দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকে বুড়ার রুটি কাড়তে চায়নি, বউঝিকে বিদেশী হারাম কাপড় পরাতে চায়নি। শাহানশাহ বাদশাহ দীনদুনিয়ার মালিক দিল্লীর তখৎনশীন সরকার-ই-আলা যখন হিন্দুস্থানের গরম বরদাস্ত না করতে পেরে এদেশ হয়ে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর যেতেন পাঠান তখন তাঁকে একবার তসলীম দিতে আসত। শাহানশাহ খুশ, পাঠান তর্। বাদশাহের মীর-বখশী পিছনের তাঞ্জাম থেকে মুঠা মুঠা আশরফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। 'জিন্দাবাদ শাহানশাহ জহানপনা' চিৎকার খাইবারের দুদিকের পাহাড়ে টক্কর খেয়ে খেয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে খুদাতালার পা-দানে গিয়ে যখন পেঁছিত তখন সে প্রশংসাধবনি লক্ষ কণ্ঠের নয়, কোটি কোটি কণ্ঠের। সে আশরফী আজ নেই, পর্বতগাত্রে প্রশংসারব প্রতিধবনিত হয় না, কিন্তু ঐ পাথরের টুকরোগুলো পাষাণ পাঠান আপন ছাতির খুন দিয়ে এখনো স্বাধীন রেখেছে। তাই তার নাম এখনো 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড।' পাঠান আর কি করতে পারত, বলুন।'

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বারবার আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আমি সে অর্থে কথাটা বলিনি। আমি ভদ্রসন্তানদের কথা ভাবছিলুম এবং তাঁরাও কিছু কম করেননি। তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ না করলে পাঠান সেপাই হয়তো আমানউল্লার বিরুদ্ধে লড়ত।'

আহমদ আলী বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের কথা বাদ দিন। এই অপদার্থ শ্রেণী যত শীঘ্র মরে ভূত হয়ে অজরঈলের দফতরে গিয়ে হাজিরা দেয় ততই মঙ্গল।'

রমজান খান আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের লড়ার কায়দা আর পাঠান সিপাহীর লড়ার কায়দা তো আর এক ধরণের হয় না। সময় যেদিন আসবে তখন দেখতে পাবেন আমাদের 'অপদার্থ' আলী কোন্ দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

আমি আহমদ আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম। আহমদ আলী বললেন, 'আমি সব কথা ভালো করে শুনতে পাইনে। একটু কালা—খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ !'

www.MurchOna.com

## সাত

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উদ্ সফ্র, নিস্ফ্ উস্ সফ্র'—অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাঙলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরতে গিয়ে আমার পাক্কা সাতদিন কেটে গেল। আটদিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যিদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হল 'আমি ভয়ঙ্কর একা।' 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্তানই বলুন এসব জায়গায় মানুষ আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিশ আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যন্ত এখনো ঠিক 'কগনিজেবল অফেন্স্' নয়। রাহাজানির সময় যদি আপনি পাঠানী কায়দায় চটপট উবুড় হয়ে শুয়ে না পড়েন তাহলে সে ভুল অথবা গোঁয়ার্তুমির খেসারতি দেবেন আপনি। রাস্তাঘাটে কি করে চলতে হয় তার তালিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কীপ টু দি লেফ্ট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটা নিতান্তই দিয়ে দেন তবে আপনার আত্মীয়স্বজন তো রয়েছেন—তাঁরা খুনের বদলাই নিলেই তো পারেন। একটা বুলেটের জন্য তো আর তালুক-মুলুক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না।

সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানিস্তান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুনখারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাঁদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু'চারটে পুলিশ দু'একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়স্বজন 'কা তব কান্তা' দর্শনে বুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনী কিম্বা তার সুচতুর আত্মীয়স্বজন আপনার আত্মীয়স্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল ধাতু দ্বারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনার জীবনের এই তিনদিনের মুসাফিরীতে কে দু'ঘন্টা আগে গেল, কে দু'ঘন্টা পরে গেল, কে বিছানায় আল্লা রসুলের নাম শুনে শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে

www.MurchOna.com

খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাবৎ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিশ কেন মিছে আপনাদের তথা খুনী এবং তস্য আত্মীয়সুজনদের মামলায় আরো ঝামেলা বাড়িয়ে সবাইকে খামকা, বেফায়দা তঙ্গ করবে? নির্বিকল্প বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিশও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনে অংশীদার। তবে হাঁ, আলবৎ, এই নশ্বর সংসারে মাঝে মাঝে রুটি-গোস্তেরও প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন তাতে সব সময় কুলিয়ে ওঠে না, খুনীর আত্মীয়সুজনকে যখন মেহেরবান খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তখন—? তখন আফগান পুলিশকে আর দোষ দিয়ে কি হবে!

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন—রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। বুখারা সমরকন্দ শিরাজ তেহরানে যদি খবর রটে যায় যে, আফগানিস্থানের রাজবর্ত্ম অত্যন্ত বিপদসংকুল তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচা-পাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফারসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরেজী না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনই যথেষ্ট ইংরেজী জানেন না, তখন তিনি ফারসীর যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারো পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবতে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পান্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরী পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দু'দিন একাসনে কাটাবেন—আমি যদি কাবুলে গিয়ে রটাই যে, তিনি গন্ডুষজলের সফরী তাহলে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল—তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন, ভাষার খাতে তাঁর জ্ঞানের জমা কতটুকু। তবু যে তিনি চাকরীতে বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্য সবাই ভাষা জানতেন তাঁর চেয়েও কম। এ তত্ত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই

www.MurchOna.com

ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে পড়ত না। গুণীরা বলেন, 'চোখের সামনে ধরা আপন বন্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট গ্রামোফোন, রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লন্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজ-সরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু—বন্দুক, গোলাগুলি আর শীতের কাপড়। বাদবাকী প্রায় সব কিছুই আমদানী করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য-প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল—ছায়াতে। এখন বাস্ যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দূরবীন দিয়ে তাকালেও একটি পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

হোস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ী ছোকরা একবার জ্বলন্ত স্পিরিটে আরো স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে বোতলে স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকড়ার ভুরু, চোখের লোম, মোলায়েম গোঁফ পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরণী কখন যেন হঠাৎ তাঁর মুখখানা সূর্য দেবের অত্যন্ত কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেখানে আগুনের এক থাবড়ায় তাঁর চুল ভুরু, সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর ঘাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর কখনো দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়াবার মত সে সব আমাদের জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে—সার হয়ে নূতন ঘাসপাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি। সূর্যদেব সেখানে একচ্ছত্রাধিপতি। এখানে নগ্ন বীভৎস দ্বন্দ্ব। বলা ভুল—এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরণী এদেশকে শস্য-শ্যামল করার চেষ্টা এখনো সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি—প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেঠেল সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসঙ্কট।

www.MurchOna.com

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোরে স্বীকার করে নিচ্ছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ঐ সংকট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বয়ং পিয়ের লোতি কি করতেন জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরু বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না। পাহাড় বাঙলা দেশে নেই—তাঁর আড়াই হাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মত করে—পুরীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাই 'পুরীর সমুদ্র দর্শনে,' অথচ তিনি যে লোতির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তাও তো নয়। তবু এ সব হল বাঙালীর কিছু কিছু দেখা—সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস নয়। কিন্তু শীতের দেশের সবচেয়ে অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীন্দ্রনাথ নিদেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচশ' বার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তবু যদি কেউ বার দশেক সেই গরম সহ্য করে খাইবারপাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তাহলে আলাদা কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারের সুখ-দুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মত। ক্ষুধানিবৃত্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার খোঁচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অনুমান করা বিচিত্র নয় খাইবারের গরম কাঁটা সরে গেলে তার থেকে কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মত রসও কিঞ্চিৎ বেরতে পারে।

আমি যে বাসে গিয়েছিলুম তাতে কোনো প্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহী, বাবুরশাহী রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তার উপযুক্ত মিলিটারী বন্দোবস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আপাদমস্তক পুরু করোগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা এবং নশ্বর ভঙ্গুর কাঁচ সে তার উইন্ড-স্ক্রীন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেড-লাইট কানা, কাঁচের অবগুণ্ঠন নেই। তখনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের Song of Songs-এ বর্ণিত এক চোখের মহিমা—

**"Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with one of thine eyes."**

যে সমস্যার সমাধান বহুদিন বহু কন্‌কর্ড বহু টীকাটিপ্পনী ঘেঁটেও করতে পারেনি, আজ এক মুহূর্তে সদ্‌গুরুর কৃপায় আর খাইবারী বাসের নিমিত্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

www.MurchOna.com

দুদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবার-পাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গাঁ ঘেঁসে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সংকীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যেকোন জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসংকটে আফগানের লক্ষ কন্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটি কণ্ঠে পরিবর্তিত হত—এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হন। তাঁদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতুষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে। কাবুলী রুমাল দিয়ে ফেটা মেরে চোখ বন্ধ করেছে। নগ্নচোখে ক'জন লোক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধূ গান্ধারী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লী যেতে হলে তো খাইবারপাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, অন্ধ বধূর দুর্দৈব দহন প্রশমিত করার জন্য মহাভারতকার গান্ধারীর অন্ধত্ব বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজীকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠান্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে।' এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজীর গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র—গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দমস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মত 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম—গোলাপী সিল্কের কোমর-

www.MurchOna.com

বন্ধে গোঁজা। কারো হাতে কানজোথা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উঠের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলু-বুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরয়ানি-পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরো চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ আর হশীশ, না ককেনই, না আরো কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে। মনে পড়ল মানস সরোবর-ফেরতা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উঁচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তড়িৎগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সজ্ঞানে যমদূতের হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমর্পণ করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উষ্ণ সমর্থন। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে দুর্দান্ত গরম। পাঠান দু'বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।'

রবীন্দ্রনাথও ঐ রকম কি একটা কথা বলেছেন না, দুঃখ না পেলে দুঃখ ঘুচবে কি করে? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে দুঃখ এড়াবার চেষ্টা করা বৃথা? মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

খ্রীষ্টও তো বলেছেন—

**'Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [ Prison ] till thou hast paid the uttermost farthing.'**

কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলী তড়িৎগতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

হৃদয়ঙ্গম করলুম, সৃষ্টি যখন তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীষ্মে রুদ্র তাঁর প্রসন্ন-কল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হত বেশী।

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবারপাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক-পিঙ্।

www.MurchOna.com

তারপর কি কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারী হরিণ নিয়ে কি করে না করে সকলেরই জানা কথা—চামড়াটুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে হাসিটুকু গুলি খাওয়ার পূর্বে মুখে লেগেছিল সেইটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে—বাদবাকী উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবারপাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু'টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদী আফ্রিদাতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ একেবারে চলে যায়। পরের দিন যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে দু'ঘন্টা লাগল কি করে, তখন সর্দারজী বলেছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ঘন্টা।

মোটর আবার চলল। কাবুলীর গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলেছিলেন, তার নির্যাস—

'কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব—কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। নেয়ে ওঠে বরফে ঘেঁষে ঘেঁষে আঙুর খাব তামাম জুলাই আগস্ট। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নয়ান-জুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অক্টোবরে শীতের হাওয়ায় ঝরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নবেম্বরে পুস্তিনের জোব্বা বের করব। ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরব। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!'

আমি বললুম,—'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

হঠাৎ দেখি সামনে এ কি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্থানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

It is absolutely forbidden
to cross this border into
Afghan territory.

কাবুলী বললেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা। অল্‌হমদুলিল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ)।'

আমি বললাম, 'আমেন।'

www.MurchOna.com

## আট

খাইবারপাস তো দুঃখে-সুখে পেরলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সংকীর্ণই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু মোটর আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে—যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আমহদ আলী যাত্রাকালে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জখম থেকে বাঁচাল।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনো কাজে লাগে কি না। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসীতেই চলে; দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

বুঝলুম, রাস্তার অবস্থা, গ্রীষ্মের আতিশয্য আর দ্বিপ্রহরের অনাহার এ-পথের ফুল-টাইম গাইড সর্দারজীকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে—তা না হলে এ রকম বীভৎস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন?

দুঃখ হল। ষাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় না সর্দারজী দেশের গাঁয়ে তেঁতলের ছায়ায় নাতি-নাতনীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল এবং বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।

www.MurchOna.com

কী দেশ! দুদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নেই সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করলুম লক্ষ বৎসরের রৌদ্রবর্ষণে তাতেও সজীব কোনো কিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তখন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকা-মাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই—খাবে কি, বাঁচবে কি দিয়ে? মা ধরণীর বুকের দুধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনো বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকদিগন্ত-ব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেতযোনি বর্মধারিণী ফোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চক্র-বালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার অদৃশ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রস্তনিত ধূমপুচ্ছ এই সর্বতশ্চলশকট শূন্যে তুলে নিয়ে বিরাট নৈস্তব্ধ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।

তারপর দেখি মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃত এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্য-ম্ভাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মসৃণ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন যাদুঘরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল সামগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

লান্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দক্কা দুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়া-লের উপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারি ভিতর দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলী করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শূন্য কোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে—ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের সৃষ্টি হয়েছে তারি উপরে ভুখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে হল ভিজে সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল ঐ

www.MurchOna.com

সবুজটুকুর কল্যাণে সে-যাত্রা আমার চোখ দুটি বেঁচে গেল। না হলে দক্কা দুর্গ প্রাকারের অন্ধ কোটর নিম্নে আমাকেও দিশেহারা হয়ে ঐ দেয়ালেরই মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব। তা হলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পেঁছিতে পারব।'

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশী দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্কার মত জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবৎ খেলুম তার জন্য ঠান্ডা জল কুঁজোতে কি করে তৈরী করা সম্ভব হল বুঝতে পারলুম না।

অফিসারটি সত্যি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমার কাতর অবস্থা দেখে বললেন, 'আজ রাতটা এখানেই জিরিয়ে যান। কাল অন্য মোটরে আপনাকে সোজা কাবুলে পাঠিয়ে দেব।' আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম যে, আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে।

অফিসারটি শিক্ষিত লোক। একলা পড়েছেন, কথা কইবার লোক নেই। আমাকে পেয়ে নির্জনে জমানো তাঁর চিন্তাধারা যেন উপছে পড়ল। হাফিজ-সাদীর অনেক বয়েৎ আওড়ালেন এবং মরুপ্রান্তরে একা একা আপন মনে সেগুলো থেকে নিংড়ে নিংড়ে যে রস বের করেছেন তার খানিকটা আমায় পরিবেশন করলেন। আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফারসীতে জিজ্ঞাসা করলুম, সঙ্গিহীন জীবন কি কঠিন বোধ হয় না? বললেন, 'আমার চাকরী পল্টনের, ইস্তাফা দেবার উপায় নেই। কাজেই বাইরের কাবুল নদীটি নিয়ে পড়ে আছি। রোজ সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি আর ভাবি যেন একমাত্র নিতান্ত আমার জন্য সে এই দুর্গের দেয়ালে আঁচল বুলিয়ে চলে গিয়েছে। অন্যায় কথাও নয়। আর দু'চারজন যারা নদীর পারে যায়, তাদের মতলব ঠান্ডা হওয়ার। আমিও ঠাণ্ডা হই, কিন্তু শীতকালেও কামাই দিইনে। গোড়ার দিকে আমিও স্বার্থপর ছিলুম, কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, তার নাচ দেখতুম, তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রান্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্য সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অমাবস্যার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনো নদীর পারে কান পেতে শুয়েছেন?'

আমি বললুম, 'নৌকোতে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি।'

তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। মনে হয় না কুলকুল শুনে, যেন আর দু'দিন কাটলেই আরেকটু, আর

www.MurchOna.com

সামান্য একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই হঠাৎ কখন এই রহস্যময়ী ভাষার অর্থ সরল হয়ে যাবে ? আপনি ভাবছেন আমি কবিত্ব করছি। আদপেই না। আমার মনে হয় মেঘের ডাক যেমন জনপ্রাণীকে বিদ্যুতের ভয় জানিয়ে দেয়, জলের ভাষাও তেমনি কোনো এক আশার বাণী জানাতে চায়। দূর সিন্ধুপার থেকে সে বাণী উজিয়ে উজিয়ে এসেছে, না কাবুল পাহাড়ের শিখর থেকে বরফের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখানে এসে গান গেয়ে জেগে উঠেছে, জানিনে।

'এখন বড্ড গরম। শীতকালে যখন আপনার ছুটি হবে তখন এখানে আসবেন। এই নদীর অনেক গোপন খবর আপনাকে বাৎলে দেব। আহারাদি ? কিচ্ছু ভাবনা নেই। মুরগী দুম্বা যা চাই। শাকসব্জী ? সে গুড়ে পাথর।'

অফিসার যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, একা থেকে থেকে বোধ হয় ভদ্রলোকের মাথা, কেমন জানি, একটুখানে—। কিন্তু কাবুল নদীর সবুজ আঁচল ছেড়ে তিনি যখন অক্লেশে দুম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন, তখনই বুঝলুম ভদ্রলোক সুস্থই আছেন। বললেন, 'আমার কাজ পাসপোর্ট সই করা আর কি মাল আসছে যাচ্ছে তার উপর নজর রাখা। কিছু কঠিন কর্ম নয়, বুঝতেই পারছেন। ওদিকে নূতন বাদশা উঠে পড়ে লেগেছেন আফগানিস্থানকে সজীব সবল করে তোলবার জন্য। অনেক লোক তার চারিদিকে জড়ো হয়েছেন। শুনতে পাই কাবুলে নাকি সর্বত্র নূতন প্রাণের সবুজ ঘাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এদিকে ইংরেজ দুম্বা, ওদিকে রুশী বকরী। সুযোগ পেলেই কাঁচা ঘাস সাফ করে দিয়ে কাবুলের নেড়া পাহাড়কে ফের নেড়া করে দেবে। ভাগ্যিস, চতুর্দিকে খোদার দেওয়া পাথরের বেড়া রয়েছে, তাই রক্ষে। আর রক্ষে এই দুম্বা আর বকরীতে কোনদিন মনের মিল হয় না। দুম্বা যদি ঘাসের দিকে নজর দেয় তো বকরী শিঙ উঁচিয়ে লাফ দিয়ে আমুদরিয়া পার হতে চায়। বকরী যদি তেড়িমেড়ি করে, তবে দুম্বা ম্যা ম্যা করে আর সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, বকরীর নজর শুধু কাবুলের চাট্টিখানি ঘাসের উপর নয়—তার আসল নজর হিন্দুস্থান, চীন, ইরান সবক'টা বড় বড় ধানক্ষেতের উপর।

আমি শুধালুম, 'দুম্বাটা শুধু শুধু ম্যা ম্যা করবে কেন ? তারো তো একজোড়া খাসা শিঙ আছে।

'ছিল। হিন্দুস্থান ভাবে, এখনো আছে, কিন্তু এদেশের পাথরে খামকা গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভোঁতা করে ফেলেছে। তাই বোধ হয় সেটা ঢাকবার জন্য সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে—গোরা সেপাইয়ের খালাসিনার জমক-

www.MurchOna.com

জোলুস দেখেছেন তো? হিন্দুস্থান সেই সোনালী শিঙের ঝলমলানি দেখে আরো বেশী ভয় পায়। ওদিক মিশরে সা'দ জগলুল পাশা, তুর্কীতে মুস্তফা কামাল পাশা, হিজ্‌জাজে ইবনে সউদ, আফগানিস্থানে আমান উল্লা খান দুমদার পিঠে কয়েকটা আচ্ছা ডান্ডা বুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো জানোয়ারই সহজে ঘায়েল হয় না। জানোয়ার তো?'

আমি আঁৎকে উঠলুম। কী ভয়ঙ্কর সিডিশন! নাঃ, তা তো নয়। মনেই ছিল না যে স্বাধীন আফগানিস্থানে বসে কথা কইছি।

অফিসার বলে যেতে লাগলেন, 'তাই আজ হিন্দুস্থান আফগানিস্থানে মিলেমিশে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে বড় খুশীর কথা। কিন্তু আপনাকে বহুত তকলিফ বরদাস্ত করতে হবে। কাবুল শক্ত জায়গা। শহরের চারিদিকে পাথর, মানুষের দিলের ভিতর আরো শক্ত পাথর। শাহানশা বাদশা সেই পাথরের ফাটলে ঘাস গজাচ্ছেন, আপনাকে পানি ঢালতে ডেকেছেন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লজ্জা দেবেন না। আমার কাজ অতি নগণ্য।'

অফিসার বললেন, 'তার হিসেবনিকেশ আর-একদিন হবে। আজ আমি খুশী যে এতদিন শুধু পেশাওয়ার পাঞ্জাবের লোক আফগানিস্থানে আসত, এখন দূর বাঙলা মুল্লুকেও আফগানিস্থানের ডাক পৌঁছেছে।'

দেখি সর্দারজী দূর থেকে ইশারায় জানাচ্ছেন, সব তৈরী—আমি এলেই মোটর ছাড়ে।

অফিসার সর্দারজীকে দেখে বললেন, 'অমর সিং বুলানীর গাড়ীতে যাচ্ছেন বুঝি? ওর মত হুঁশিয়ার আর কলকব্জায় ওস্তাদ ড্রাইভার এ রাস্তায় আর কেউ নেই। এমন গাড়িও নেই যার গায়ে অমর সিংয়ের দুটো ঠোক্কর, দুটো চারটে কদরের চাঁটি পড়েনি। কোনো বেয়াড়া গাড়ি যদি বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করে তবে শেষ দাওয়াই তার ঘোমটা খুলে কানের কাছে বলা, 'ওঝা অমর সিংকে খবর দেওয়া হয়েছে।' আর দেখতে হবে না। সেলফ্—স্টার্টার না, হ্যান্ডিল না, হঠাৎ গাড়ি পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকে। ড্রাইভার কোনো গতিকে যদি পিছন দিকে ঝুলে পড়তে পারে তবেই রক্ষা।

'কিন্তু হামেশাই দেখবেন লাইনের সবচেয়ে লজ্‌ঝড় গাড়ি চালাচ্ছে অমর সিং। একটা মজা দেখবেন?' বলে তিনি অমর সিংকে ডেকে বললেন, 'সর্দারজী, আমি একখানা নয়া গাড়ি কিনেছি। সিধা আমেরিকা থেকে আসছে। তুমি চালাবে? তন্‌খা এখন যা পাচ্ছে তাই পাবে।'

অফিসারের নজরে পড়াতে সর্দারজী তো হাসিমুখে এসে সালাম করে

www.MurchOna.com

দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কথা শুনে মুখ গম্ভীর হল। পাগড়ির ন্যাজটা দুহাতে নিয়ে সর্দারজী ভাঁজ করেন আর ভাঁজ খোলেন—নজরও ঐদিকে ফেরানো। তারপর বললেন, 'হুজুরের গাড়ি চালানো বড়ী ইজ্জৎকী বাৎ কিন্তু আমার পুরানো চুক্তির মেয়াদ এখনো ফুরোয়নি।'

অফিসার বললেন, 'তাই নাকি? বড় আফসোসের কথা। তা সে চুক্তি শেষ হলে আমায় খবর দিয়ো। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি ক্ষুদে আগাকে (অর্থাৎ আমাকে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো? নতুন গাড়ি সে চালাতে চায় না। চুক্তি-ফুক্তি সব বাজে কথা। আমার ড্রাইভারের দরকার শুনলে এ লাইনের কোনো মোটরের গোঁসাই চুক্তির ফপরদালালী করতে পারে বলুন তো! তা নয়। অমর সিং নূতন গাড়ি চালিয়ে সুখ পায় না। পদে পদে যদি টায়ার না ফাটল, এঞ্জিন না বিগড়ল, ছাতখানা উড়ে না গেল, তবে সে মোটর চালিয়ে কি কেরামতি? সে গাড়ি তো বোরকা-পরা মেয়েই চালাতে পারে।

'আমার কি মনে হয় জানেন? বুড়ী মরে গিয়েছে। মোটরের বনেট খুলতে পেলে সে এখন বউয়ের ঘোমটা খোলার আনন্দ পায়। নূতন গাড়িতে তার অজুহাতে কোথায়?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউয়ের ঘোমটা খোলার জন্য আবার অজুহাতের প্রয়োজন হয় নাকি?'

অফিসার বললেন, 'হয়, হয়। রাজাধিরাজের বেলাও হয়। শুনুন, কাবুল-বদখশান আধা হিন্দুস্থানের মালিক হুমায়ুন বাদশা জুবেদীকে কি বলেছেন—

তব, যদি সাধি তোমা, ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায়;
বল তুমি, 'রহি অবগুন্ঠনের মাঝে
এ-রূপ দেখাতে নারি হায়।'
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন?
আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ।
একি গো সমরলীলা তোমায় আমায়?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার;
মরমের মর্ম যাহা তাই তুমি মোর
জীবনের জীবন আমার!

—সত্যেন দত্তের অনুবাদ

www.MurchOna.com

## নয়

আফগানিস্থানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তার পক্ষে পীর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটল, আর এঞ্জিন সর্দারজীর উপর গোসা করে দুবার গুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাণ্ডিম্যান—তদারক করলেন সর্দারজী। প্রচুর সলুসনের মেহদী-প্রলেপ লাগিয়ে বিবিজানের কদম মবারক মেরামত করা হল, কিন্তু তাঁর মুখ ফোটাবার জন্য স্বয়ং সর্দারজীকে ওড়না তুলে অনেক কাকুতিমিনতি করতে হল। একবার চটে গিয়ে তিনি হ্যাণ্ডল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন—শেষটায় কোন্ শর্তে রফারফি হল, তার খবর আমরা পাইনি বটে, কিন্তু হরেকরকম আওয়াজ থেকে আমেজ পেলুম বিবিজান অনিচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পেঁছবার কয়েক মাইল আগে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ, কিম্বা বেল্ট—যাই বলুন, ছিঁড়ে দু'টুকরো হল। তখন খবর পেলুম সর্দারজীও রাতকানা। রেডিয়োর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, 'অদ্যকার মত আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হল। কাল সকালে সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।'

আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সারেব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকী আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। বুঝলুম, এদেশেও বাস চড়ার পূর্বে সাদা কালিতে কাবিননামায় লিখে দিতে হয়, 'বিবিজানের খুশীগমীতে তাঁহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে গররাজী হইব না।'

সর্দারজী তম্বী করে বললেন, 'একটু পা চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।'

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মত দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। 'কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে' বলতে আমাদের চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই। ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা—তার ভিতর দিয়ে উট, বাস, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরতে হবে না।

www.MurchOna.com

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কি বুঝতে অবশ্য বেশী সময় লাগল না। এলাকাটা মৌসুমী হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না—যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দরশাহী বাজরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব 'অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে তোলা যায়। চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা। বাইরের হাওয়া তারি সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বেরবার পথ নেই দেখে ঐ জালিয়ানওয়ালাবাগে আর ঢোকে না। সূচীভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচীভেদ্য দুর্গন্ধ শুঁকলুম।

দুর্গপ্রাকারকে পিছনের দেয়ালস্বরূপ ব্যবহার করে চার সারি কুঠরি নয়—খোপ। শুধু দরজার জায়গাটা ফাঁকা। খোপগুলোর তিন দিক বন্ধ—সামনের চত্বরের দিক খোলা। বেতারওয়ালা সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে দর-কষাকষি করে আমাদের জন্য একটা খোপ ভাড়া নিলেন—আমার জন্য একখানা দড়ির চারপাইও যোগাড় করা হল। খোপের সামনের দিকে একটু বারান্দা, চারপাই সেখানে পাতা হল। খোপের ভিতর একবার এক লহমার তরে ঢুকেছিলুম—মানুষের কত কুবুদ্ধিই না হয়। ধর্ম সাক্ষী, স্মেলিং সল্টে যার ভিরমি কাটে না, তাকে আধ মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখতে হবে না।

কেরোসিন কুপির ক্ষীণ আলোকে যাত্রীরা আপন আপন জানোয়ারের তদারক করছে। উট যদি তাড়া খেয়ে পিছু হাটতে আরম্ভ করল, তবে খচ্চরের পাল চিৎকার করে রুটিওয়ালার বারান্দায় ওঠে আর কি। মোটর যদি হেডলাইট জ্বালিয়ে রাত্রিবাসের স্থান অনুসন্ধান করে, তবে বাদবাকী জানোয়ার ভয় পেয়ে সব দিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। মালিকেরা তখন আবার চিৎকার করে আপন আপন জানোয়ার খুঁজতে বেরোয়। বিচুলি নিয়ে টানাটানি, রুটির দোকানে দর-কষাকষি, মোটর মেরামতের হাতুড়ি পেটা, মোরগ-জবাইয়ের ঘড়ঘড়ানি, আর পাশের খোপের বারান্দায় খান সায়েবের নাক-ডাকানি। তার নাসিকা আর আমার নাকের মাঝখানে তফাত ছয় ইঞ্চি। শিথান বদল করার উপায় নেই—পা তাহলে পশ্চিম দিকে পড়ে ও মুখ উটের নেজের চামর ব্যজন পায়। আর উট যদি পিছু

www.MurchOna.com

হটতে আরম্ভ করে, তবে কি হয় না-হয় বলা কিছু কঠিন নয়। গোমূত্রের মত পবিত্র জিনিসেও প্রপাতস্নানের ব্যবস্থা নেই।

তবে একথা ঠিক, দুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞান অন্বেষণ অথবা আড্ডার সন্ধানে একটা চক্কর লাগায়, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে না। আহমদ আলীর ফিরিস্তিমাফিক সব জাত সব ভাষা তো আছেই, তার উপরে গুটিকয়েক সাধু-সজ্জন, দু'-একজন হজ-যাত্রী—পায়ে চলে মক্কা পৌঁছবার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এঁদের চোখেমুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই; কারণ এঁরা চলেন অতি মন্দগতিতে এবং নোংরামি থেকে গা বাঁচাবার কায়দাটা এরা ফ্রন্টিয়ারেই রপ্ত করে নিয়েছেন। সম্বল-সামর্থ এদের কিছুই নেই—উপরে আল্লার মরজি ও নিচে মানুষের দাক্ষিণ্য এই দুই-ই তাঁদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আভাস ইঙ্গিতও আছে—কিছু সেগুলো হির্শফেল্ট্ সায়েবের জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাত-সকালে পেশাওয়ারের আণ্ডা-রুটি খেয়ে বেরিয়েছিলুম, তারপর পেটে আর কিছু পড়েনি। দল্লার শরবৎ পেট পর্যন্ত পৌঁছায়নি, শুকনো তালু-গলাই তাকে শুষে নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকের নোংরামিতে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোনো কিছু গিলবার প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আধিখ্যেতার নিজের উপর বিরক্তিও ধরছিল—'আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমচ্ছে, তখন তুমিই বা এমন কোন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি যে, তোমার স্নান না হলে চলে না, মাত্র দু'হাজার বছরের জমানো গন্ধে তুমি ভিরমি যাও। তবু তো জানোয়ারগুলো চত্বরে, তুমি বারান্দায় শুয়ে। মা জননী মেরী সরাইয়েও জায়গা পাননি বলে শেষটায় গাধা-খচ্চরের মাঝখানে প্রভু যীশুর জন্ম দেন নি? ছবিতে অবশ্য সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু এঁকেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে ক'টা মাছ?

'বেৎলেহেমের সরাইয়ে আর আফগানিস্থানের সরাইয়ে কি তফাত? বেৎলেহেমেও বৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইহুদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার? আফগানিস্থানের গন্ধে তোমার গা বিড়োচ্ছে, কিন্তু ইহুদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দরমা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।'

এই সব হল তত্ত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মানুষের মনের ভিতর যে রকম গীতা-পাঠ হয়, সে রকম বেয়াড়া দুর্যোধনও সেখানে ব'সে। তার শুধু এক উত্তর, 'জানামি ধর্মং, ন চ মে প্রবৃত্তি', অর্থাৎ 'তত্ত্বকথা আর নূতন

www.MurchOna.com

শোনাচ্ছ কি, কিন্তু ওসবে আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার উপর আমার বেয়াড়া মনের হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। 'সর্দারজী ও 'বনেটবাসিনীতে যদি সাঁঝে ঝোঁকে ঢলাঢলি আরম্ভ না হ'ত তবে অনেক আগেই জলালাবাদের সরকারী ডাক-বাঙলোয় পেঁাছে সেখানে তোমাতে আমাতে স্নানাহার করে এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়, চিনার গাছের দোদুল হাওয়ায় মনের হরিষে নিদ্রা যেতুম না ?'

বেয়াড়া মন কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানেরও সন্ধান রাখে—না হলে বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটায় কি করে ? ফিস ফিস করে তর্ক'ও জুড়ে দিয়ে বলল, 'মা মেরী ও যীশুর যে গল্প বললে সে হ'ল বাইবেলি কেচ্ছা। মুসলমান শাস্ত্রে আছে, বিবি মরিয়ম (মেরী) খেজুর-গাছের তলায় ইসা-মসীহকে প্রসব করেছিলেন।'

বিবেকবুদ্ধি—'সে কি কথা ! ডিসেম্বরের শীতে মা মেরী গেলেন গাছতলায় ?'

বেয়াড়া মন—'কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভু জন্ম-গ্রহণ করলে পর দেবদূতেরা সেই সুসমাচার মাঠের মাঝখানে গেয়ে রাখাল ছেলেদের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মাঠে কাটাতে পারে, তবে ছুতোরের বউই পারবে না কেন, শুনি ? তার উপর গর্ভযন্ত্রণা—সর্বাঙ্গে তখন গল গল করে ঘাম ছোটে !'

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আদপেই পছন্দ করিনে। দু'জনকে দুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা প্রহরী শিখর। সেখান থেকে হঠাৎ এক হুঙ্কারধ্বনি নির্গত হয়ে আমার তন্দ্রাভঙ্গ করল। শিখরের চুড়ো থেকে সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলছিল, 'সরাই যদি রাত্রি-কালে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে হে যাত্রীদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদারি তোমাদের নিজের।'

ঐটুকুই বাকী ছিল। সরাইয়ের সব কষ্ট চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিয়েছিলুম ঐ জানটুকু বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়ালা সেই জিম্মাদারি-টুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনো ভরসা কোনো দিকে রইল না, তখন আমার মনে এক অদ্ভুত শান্তি আর সাহস দেখা দিল। উর্দুতে বলে, 'নঙ্গেসে খুদাভী ডরতে হ্যাঁয়' অর্থাৎ 'উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সমঝে চলেন।' সোজা বাঙলায় প্রবাদটা সামান্য অন্যরূপ নিয়ে অল্প একটু গীতিরসে ভেজা হয়ে বেরিয়েছে, 'সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার ?'

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরও একটা খটকা লাগল। রেডিয়োওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ঐ

www.MurchOna.com

যে সরাইওয়ালা বলল, 'মাল-জানের' তদারকি আপন আপন কাঁধে এ কথাটা আমার কানে কেমনতরো নূতন ঠেকলো। সমাসটা কি জান-মাল নয় ?'

অন্ধকারে রেডিয়োওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁর কথা অনেকটা বেতারবার্তার মত কানে এসে পেঁছিল। বললেন, 'ইরানদেশের ফার্সীতে বলে 'জান-মাল', কিন্তু আফগানিস্থানে জান সস্তা, মালের দাম ঢের বেশী। তাই বলে 'মাল-জান।'

আমি বললুম, 'তাই বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজায় সস্তা—তাই আমরাও বলি, 'ধনে-প্রাণে' মেরো না। 'প্রাণে-ধনে' মেরো না কথাটা কখনো শুনিনি।'

আমাতে বেতারওয়ালাতে তখন এতটা ছোটখাটো 'ব্রেন্‌স্‌-ট্রাস্ট্‌' বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ফ্রন্টিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপন্ন হয় না। তবে আপনার মুখে এরকম কথা কেন ?'

আমি বললুম, 'বুলেট ছাড়া অন্য নানা কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে। জ্বর আছে, কলেরা আছে, সান্নিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারো মাসই খোলা রয়েছে। সে পথ ধরলে দু-দণ্ড জিরোবার তরে সরাই-ই বলুন, আর হাসপাতালই বলুন কোনো কিছুরই বালাই নেই।'

বেতারবাণী হ'ল, 'না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর করে রাখার নিঃসন্দার্থ প্রচেষ্টার নামান্তর 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন।' কিন্তু আফগানরা প্রাচ্যভূমির ছোটজাত বলে নিজের মোট নিজেই বইবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় 'ধর্মপ্রাণ' মিশনরীরা, তাই আফগানিস্থানে তাদের ঢোকা কড়া বারণ। কোনো অবস্থাতেই কোনো মিশনরীকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। মিশনরীর পরে আসে ইংরেজ। তাদেরও আমরা পারত-পক্ষে ঢুকতে দিই না—ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের জন্য যে ক'জন ইংরেজের নিতান্ত প্রয়োজন তাদেরি আমরা বড় অনিচ্ছায় বরদাস্ত করেছি।'

এই দুটি খবর আমার কর্ণকুহরে মথি ও মার্ক লিখিত দুই সুসমাচারের ন্যায় মধুসিঞ্চন করল। গুলিস্তান, বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল দুর্গন্ধ মেরে ফেলে আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তন্দ্রা এনে দিল।

'জিন্দাবাদ আফগানিস্থান !' না হয় থাকলই বা লক্ষ লক্ষ ছারপোকা সে দেশের চারপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে।

www.MurchOna.com

## দশ

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। নামাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবী উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে তুর্কীস্থানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কি করে! বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।' আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে করেন?' আমার এই সঙ্কোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্যদেশে অচেনা অজানা লোককে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশীই হয়।

মোটরে বসে তারি খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমা-খরচা নিতে লাগলুম।

গ্রেট ইস্টার্ন পান্থশালা, আফগান সরাইও পান্থশালা। সরাইয়ের আরাম-ব্যারাম তো দেখা হল—গ্রেট ইস্টার্ন, গ্রান্ডেরও খবর কিছু কিছু জানা আছে।

মার্কস্ না পড়েও চোখে পড়ে যে সরাই গরীব, হোটেল ধনী। কিন্তু প্রশ্ন তাই দিয়ে কি সব পার্থক্যের অর্থ করা যায়? সরাইয়েও জন আষ্টেক এমন সদাগর ছিলেন যারা অনায়াসে গ্রেট ইস্টার্নের সুইট নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্নের বড় সায়েবদেরও কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচারব্যবহারে কী ভয়ঙ্কর তফাত। এই আটজন ধনী সদাগর ইচ্ছে করলেই একত্র হয়ে উত্তম খানাপিনা করে জুয়োয় দু'শ' চার শ' টাকা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। চাকরবাকর সন্ত্রস্ত হয়ে হুজুরদের হুকুম তালিম করত—সরাইয়ের ভিখিরি ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই, সাধুসজ্জনদের সঙ্গেও এঁদের কোনো যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন স্বিরদরস্তম্ভে এঁরা তো বসে থাকলেনই না—আটজনে মিলে 'খানদানী' গোঠও এরা পাকালেন না। নিজ নিজ পণ্য-বাহিনীর ধনী গরীব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার উপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা আরো পাঁচজনের তত্ত্বতাবাশ করতে আরম্ভ করলেন। আর ফলে হরেক রকমের আড্ডা জমে উঠল; ধনী গরীবের পার্থক্য জামা

www.MurchOna.com

কাপড়ে টিকে থাকল বটে কিন্তু কথা-বার্তায় সে সব তফাত রইল না। দু-চারটে মোসাহেব 'ইয়েস্‌মেন' ছিল সন্দেহ নেই, তা সে গরীব আড্ডা-সর্দারেরও থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য, তত্ত্বকথা, দেশ-বিদেশের রাস্তাঘাট-গিরিসঙ্কট, ইংরেজ-রুশের মন-কষাকষি, পাগলা উট কামড়ালে তার দাওয়াই, সর্দারজীর মাথার ছিট, সব জিনিস নিয়েই আলোচনা হল। গরীব ধনী সকলেরই সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কখনো ডুবল কখনো ভাসল; কিন্তু বাকচতুর গরীবও ধনীর পোলাও-কালিয়ার আশায় বেশরম বাঁদরনাচ নাচল না।

ঝগড়া-কাজিয়াও আড্ডার চোখের সামনের চাতালে হচ্ছে। কথাবার্তার খোঁচা-খুঁচিতে যতক্ষণ উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড্ডা সে সব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু মারামারির পূর্বাভাস দেখা দিলেই কেউ-না-কেউ মধ্যস্থ হয়ে বখেড়া ফৈসালা করে দেয়। মনে পড়ল বায়স্কোপের ছবি ঃ সেখানে দুই সায়েবে ঝগড়া লাগে, পাঁচজন হঠে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ায়। দুই সায়েব তখন কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলেন, আর সকলের দয়ার শরীর, কোটটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তারপর শুরু হয় ঘুষোঘুষি রক্তারক্তি। পাঁচজন বিনা টিকিটে তামাশা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটাকে 'অন্য লোকের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার' নাম দিয়ে ক্ষীণ বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারো কোনো নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই। তাই পার্সোনাল ইডিয়সিংক্রেসি বা খেয়াল খুশীর ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন, সকলেই যে যার খুশী মত কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনিও আপনার পছন্দমত যা খুশী করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না। হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো মন্দ দুই-ই হয়। একদিকে যেমন গরম, ধুলো, তৃষ্ণা সত্ত্বেও মানুষ একে অন্যকে প্রচুর বরদাস্ত করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সকলেই সরাইয়ের কুঠরি-চত্বর নির্মমভাবে নোংরা করে।

একদিকে নিবিড় সামাজিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ। অর্থাৎ 'কমুনিটি সেন্স' আছে কিন্তু 'সিভিক সেন্স' নেই।

ভাবতে ভাবতে দেখি সরাইয়ে এক রাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। হুঁশিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখব আর কি? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশূন্য শিবাপর্বত।

www.MurchOna.com

সর্দারজীকে বললুম, 'রাত্তিরে যখন গা বিড়োচ্ছিল তখন একটু সুপুরি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

সর্দারজী বললেন, 'পান কোথায় পাবেন, বাবুসায়েব ? পেশাওয়ারেই শেষ পানেড় দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাকের কোথাও পান দেখিনি—পল্টনে ড্রাইভারি করার সময় এসব দেশ আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। পাঠানও তো পান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গ্রাহক সব পাঞ্জাবী।'

তাই তো। মনে পড়ল, কলুটোলা জাকারিয়া স্ট্রীটে হোটেলের গাড়ী বারান্দার বেঞ্চে বসে কাবুলীরা শহর রাঙা করে না বটে। আরো মনে পড়ল, দক্ষিণ-ভারতে বর্মা-মালয়ে এমন কি খাসিয়া পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয়—যদিও এদের কেউই কাশী-লক্ষ্ণৌয়ের মত তরিবৎ করে জিনিসটার রস উপভোগ করতে জানে না। তবে কি পান অনার্য জিনিস ? 'পান' কথাটা তো আর্য—'কর্ণ' থেকে 'কান', 'পর্ণ' থেকে 'পান'। তবে 'সুপারি' ? উঁহু, কথাটা তো সংস্কৃত নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া'—সেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'গুয়া' কথাটার 'গুবাক' না গুবাক কি একটা সংস্কৃত রূপ আছে না ? কিন্তু তাহলেও তো কোনো কিছুর সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নাসিক আর্যভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়ে গাছের ডগায় আশ্রয় নেবেন কেন ? আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়, কিন্তু গৃহসূত্রের ফিরিস্তিতে গুবাক—গুবাক ? নাঃ। মনে তো পড়ে না। তবে কি এ নিতান্তই অনার্য-জনসুলভ সামগ্রী ? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশাওয়ার অবধি পৌঁচেছে ? সাধে বলি, ভারতবর্ষ তাবৎ প্রাচ্য সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসি জিগির তুলে বড্ড বেশী চেঁচামেচি করাতে দক্ষিণ-ভারতের এক সাধক বলেছিলেন, 'তাহলে সবাই ঘুমিয়ে পড়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষে মানুষে ভেদ থাকে না, সবাই সমান।' সেই গরমে বসে বসে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলুম। ঝাঁকুনি, ধুলো, কঠিন আসন, ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্ত্বেও বেতার-কর্তা ও আমার দুজনেরই ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঢলে পড়ছিল, আমি তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁর ঘুমে তা দিচ্ছিলুম। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনী খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি আমার কাছে মাফ চেয়ে শক্ত হয়ে বসছিলেন। তখন আমার পালা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভদ্রতার বেড়া ভেঙ্গে আমার মাথা তাঁর কাঁধে জিরিয়ে নিচ্ছিল।

www.MurchOna.com

চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ঠান্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা—রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলালাবাদ।'

দক্কার পাশের সেই কাবুল নদীর কৃপায় এই জলালাবাদ শস্যশষ্প-শ্যামল। এখানে জমি বোধ হয় দক্কার মত পাথরে ভর্তি নয় বলে উপত্যকা রীতিমত চওড়া—একটু নিচু জমিতে বাস্ নামার পর আর তার প্রসারের আন্দাজ করা যায় না। তখন দুদিকেই সবুজ, আর লোক-জনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কি মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জলালাবাদে তার অতি মধুর তসবীর? এমন কি যে দুটো-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হল। লক্ষ্য করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের 'বেপর্দামির' নিন্দা করে, তারি বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মত। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতারকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরীব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্ততঃ আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে কখনো পর্দা মেনে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টা করে, কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আরবের বেদুইন মেয়েরা?'

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'

থাক্, উপস্থিত এসব আলোচনা। গোটা দেশটা প্রথম দেখে নিই, তারপর রীতি-রেওয়াজ ভালো-মন্দের বিচার করা যাবে।

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জলালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলীরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভিতর অন্তর্ধান। কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, 'বাস্ ফের ছাড়বে কখন?' আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজীকে শুধালুম, 'বাস্ আবার ছাড়বে কখন?' সর্দারজী বললেন, 'আবার যখন সবাই জড়ো হবে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'সে কবে?' সর্দারজী যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তার কি জানি? সবাই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবে যখন তখন।'

বেতারকর্তা বললেন, 'ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কি? আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই বা কখন?'

www.MurchOna.com

তিনি বললেন, ওদের জন্য আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন ? আপনি তো ওদের জান-মালের জিম্মাদার নন।'

আমি বললুম, 'তা তো নই-ই। কিন্তু যে রকমভাবে হুট্ করে সবাই নিরুদ্দেশ হল তাতে তো মনে হল না যে ওরা শিগগির ফিরবে আজ সন্ধ্যায় তাহলে কাবুল পেঁছিব কি করে ?'

বেতারকর্তা বললেন, 'সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পেঁছিবার কোনো তাড়া নেই। বাস্ যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পেঁছিত পনেরো দিনে, এখন চারদিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। ওরা খুশী, ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে না, গালপত্র তদারক করে গাধা-খচ্চরের পিঠে চাপাতে-নামাতে হচ্ছে না, তাদের জন্য বিচুলির সন্ধান করতে হচ্ছে না। জলালাবাদে পেঁচেছে, এখানে সকলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ না কেউ আছে, তাদের তত্ত্বতাবাশ করবে, খাবেদাবে, তারপর ফিরে আসবে।'

আমি চুপ করে গেলুম। দক্কাতে অফিসারকে বলেছিলুম, 'আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে,' এখন বুঝতে পারলুম সব মানুষই কিছু-না-কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তফাত শুধু এইটুক, কেউ করে জেনে, কেউ না জেনে।

আফগানিস্থানের বড় শহর পাঁচটি। কাবুল, হিরাত, গজনী, জলালাবাদ, কান্দাহার। জলালাবাদ আফগানিস্থানের শীতকালের রাজধানী। তাই এখানে রাজপ্রাসাদ আছে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য খাস পান্থনিবাস আছে।

বেতারবাণী যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপস্থিত জলালাবাদের বাজার দেখে আফগানিস্থানের অন্যতম প্রধান নগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলুম না। সেই নোংরা মাটির দেয়াল, অত্যন্ত গরীব দোকানপাট—সস্তা জাপানী মালে ভর্তি—বিস্তর চায়ের দোকান, আর অসংখ্য মাছি। হিমালয়ের চট্টিতে মানুষ যে রকম মাছি সম্বন্ধে নির্বিকার, এখানেও ঠিক তাই।

হঠাৎ আখ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চৌকো চৌকো করে কেটে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে এবং তার উপরে দুনিয়ার সব মাছি বসাতে চেহারাটা চালে-তিলের মত হয়ে গিয়েছে। ঘিনপিত ঝেড়ে ফেলে কিনলুম এবং খেয়ে দেখলুম, দেশের আখের চেয়েও মিষ্টি। সাধে কি বাবুর বাদশা এই আখ খেয়ে খুশী হয়ে তার নমুনা বদখশান বুখারায় পাঠিয়েছিলেন ! তারপর দেখি, নোনা ফুটি শসা তরমুজ। ঘন সবুজ আর সোনালী হলদেতে ফলের দোকানে রঙের অপূর্ব খোলতাই হয়েছে—

www.MurchOna.com

খুশবাই চতুর্দিক মাত করে রেখেছে। দরদস্তুর না করে কিনলেও ঠকবার ভয় নেই। রপ্তানি করার সুবিধে নেই বলে সব ফলই বেজায় সস্তা। বেতারবার্তা জ্ঞান বিতরণ করে বললেন, 'যারা সত্যিকার ফলের রসিক তারা এখানে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ফল খেয়েই কাটায় আর যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও কিসমিস আখরোট পেস্তা বাদামের উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে রুটি-পনির আর কদাচিৎ কখনো এক টুকরো মাংস। এরাই সব চাইতে দীর্ঘজীবী হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এদের গায়ে বুলেট লাগে না বুঝি? জলালাবাদের ফল তাহলে মন্ত্রপূত বলতে হয়।'

বেতারবার্তা বললেন, 'জলালাবাদের লোক গুলী খেতে যাবে কেন? তারা শহরে থাকে, আইনকানুন মানে, হানাহানির কিবা জানে?'

কিন্তু জলালাবাদের যথার্থ মাহাত্ম্য শহরের বাইরে। আপনি যদি ভূবিদ্যার পান্ডিত্য প্রকাশ করতে চান তবে কিঞ্চিৎ খোঁড়াখুঁড়ি করলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আপনি যদি নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে চান তবে চারিদিকের নানাপ্রকারের অনুন্নত উপজাতি আপনাকে দেদার মালমশলা যোগাড় করে দেবে। যদি মার্কস্‌বাদের প্রাচাদেশীয় পটভূমি তৈরী করতে চান তবে মাত্র এঙ্গেল্‌সের 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি' খানা সঙ্গে নিয়ে আসুন, বাদবাকী সব এখানে পাবেন—জলালাবাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবার পত্তনের ভিৎ, আর এক শ' মাইল দূরে কাবুলে রাষ্ট্রনির্মাণের গম্বুজ-শিখর বিরাজমান। যদি ঐতিহাসিক হন তবে গান্ধারী, সিকন্দর, বাবুর, নাদিরের বিজয় অভিযান বর্ণনার কতটা খাঁটী কতটা ঝুটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূগোল অর্থনীতির সমন্বয় প্রমাণ করতে চান যে তিন ফোঁটা নদীর জল কি করে নব নব মন্বন্তরের কারণ হতে পারে, তাহলে জলালাবাদে আস্তানা গেড়ে কাবুল নদীর উজান ভাঁটা করুন। আর যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রঙভূমি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদ্দা গ্রামে। ধ্যানী বুদ্ধ, কঙ্কালসার বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপরে কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। ঢিপিঢাপা দেখামাত্র অজ্ঞলোকেও বলতে পারে।

আর যদি আপনি পান্ডিত্যের বাজারে সত্যিকার দাঁও মারতে চান, তবে দেখুন সিন্ধুর পারে মোন্‌-জো-দড়ো বেরল, ইউফ্রেটিস টাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা বেরল, নীলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরল—এর সব কটাই পৃথিবীর প্রাকআর্য প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই, নর্দমার পারে ঐরকম একটা দাঁও মারার জন্য একপাল পন্ডিত মাথায়

www.MurchOna.com

গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বাজার কোণঠাসা করতে পারবেন না, উল্টে দেউলে হবার সম্ভাবনাই বেশী। আর যদি নিতান্তই বরাতজোরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল বাঁড়ুজ্যে। একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচামাল বিলেত নিয়ে গিয়ে তিন ভলুম চামড়ায় বেঁধে আপনারি মাথায় ছুঁড়ে মারবে। শোনেননি, গুণী বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দু'বার ঠকলে তোমার দোষ।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন্-জো-দড়োর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্থানের চার আনা। বিশেষতঃ যখন আফগানিস্থানে কাক চিল নেই—আপনার মেহন্নতের মাল নিয়ে তারা চুরিচামারি করবে না।

জানি, পন্ডিত মাত্রই সন্দেহ-পিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরেই নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল ফলে আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে অ্যান্দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির পাল সেখানে ঝামেলা লাগায়নি কেন ?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন। ইংরেজ এবং অন্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের পান্ডিত্যামন্বরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড্ডীয়মান তাদের সর্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আপনার রঙ দিব্যি বাদামী, আপনি প্রতিবেশী, আফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে—আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনারি জাতভাই বহু ভারতীয় এখনো আফগানিস্থানে ছোটোখাটো নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমন কি বসবাসও করে, আপনাকে আনাচে কানাচে ঘুরতে দেখলে কাবুলীওয়ালা আর যা করে করুক, আঁৎকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।

তবু শুনবেন না ? সাধে বলি, সব কিছু পন্ড না হলে পন্ডিত হয় না।

*S. M. MAHBUB*

## এগার

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পেঁছবার আর কোনো ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ এক শ' মাইল, জলালাবাদ থেকে কাবুল আরো এক শ' মাইল। শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পেঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে

www.MurchOna.com

জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশেপাশে গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তায় খেলাধুলো করছে। তারি এক খেলা মোটরের জন্য রাস্তায় গোলকধাঁধা বানিয়ে দেওয়া। কায়দাটা নূতন। কাবুলীরা যে আন্ডার মত শক্ত টুপির চতুর্দিকে পাগড়ি জড়ায়, ছোঁড়ারা সেই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে দুটো-চারটে থেঁৎলে দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে পেলেই সর্দারজী দাড়িগোঁফের ভিতরে বিড়বিড় করে কি একটা গালাগাল দিয়ে মোটরের বেগ কমান। কয়েকবার এ রকম লক্ষ্য করার পর বললুম, 'দিন না 'দুটো-চারটে থেঁৎলে। ছোঁড়াদের তাহলে আক্কেল হয়।' সর্দারজী বললেন, 'খুদা পনাহ্। এমন কর্ম করতে নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বুঝতে না পেরে বললুম, সে কি কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ছ্যাঁদা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলাটার আসল মর্মই ধরতে পারেননি। টুপির ভিতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোঁতা লম্বা লোহা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ি বাঁচানো হল; যদি টুপি থেঁৎলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটরওয়ালাদের শেখাতে চায়, 'পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়।'

সর্দারজী বললেন, 'ওঃ, আপনার কি পরিষ্কার মাথা!'

বেতারবাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিই বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভগ্নাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসার প্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ডাইনে হটলেই পেঁছবেন হাদ্দায়। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধমূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন, সে আমলের লোক নানা রকম মূর্তি জড়ো করে যাদুঘর বানাত?'

এ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কনিষ্কের আমলে গান্ধার-বাসীরা যাদুঘর নির্মাণ করিত কিনা?'

ফেল মারলুম। কিন্তু বাঙালী আর কিছু পারুক না পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত। বললুম, 'কিন্তু কাল রাত্রে সরাইয়ে নিজের 'জান-মাল,'—থুড়ি, 'মাল-জান' সম্বন্ধে যে সতর্কতার হুঙ্কার শুনতে পেলুম তা থেকে তো মনে হ'ল না প্রভু তথাগতের সাম্যমৈত্রীর বাণী শুনছি।'

www.MurchOna.com

বেতারবার্তা বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশু-শাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম। পূর্ণবয়স্ক, প্রাণবন্ত দুর্ধর্ষ পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি কিন্তু একথা বার বার স্বীকার করব যে, এই আধা-ইনসান পাঠান জাতকে কেউ যদি ধর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে তবে সে ইসলাম।'

আমি তো ভয় পেয়ে গেলুম। এইবার লাগে বুঝি। 'আধা-ইনসান' অর্থাৎ 'অর্ধ-মনুষ্য' বললে কার রক্ত গরম না হয়। কিন্তু বেতারবাণী অত্যন্ত সৌম্য বৌদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আপনি বিদেশী এবং আমাদের সকলের চেয়ে বেশী লোকজনের সংস্রবে এসেছেন, তার উপর আপনি বয়সে প্রবীণ। আপনার এই মত শুনে ভারী খুশী হলুম।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সর্দারজীকে আস্তে আস্তে উর্দুতে শুধালুম, 'একি কাণ্ড? আপনি এঁর জাত তুলে এঁকে আধা-ইনসান বললেন আর ইনি খুশী হয়ে আপনাকে তসলীম করলেন!'

সর্দারজী আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ইনি চটবেন কেন? ইনি তো কাবুলী।'

আমি আরো সাত হাত জলে। ফের শুধালুম, 'কাবুলী পাঠান নয়?'

সর্দারজী তখন আমার অজ্ঞতা ধরতে পেরে বুঝিয়ে বললেন, 'আফগানিস্থানের অধিবাসী পাঠান কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইরান দেশ থেকে এসে সেখানে বাড়িঘরদোর বেঁধে শহর জমিয়েছে। তাদের মাতৃ-ভাষা ফার্সী। পাঠানের মাতৃভাষা পশতু। বেতারের সায়েব পশতু ভাষার এক বর্ণও বোঝেন না।'

আমি বললুম, 'তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু কলকাতার কাবুলী-ওয়ালারা তো ফার্সী বোঝে না।'

'তার কারণ কলকাতার কাবুলীরা কাবুলের লোক নয়। তারা সীমান্ত, খাইবার, বড় জোর চমন কান্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাবুলী পারতপক্ষে কাবুল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে দু'দশ জন যায় তারা সদাগর। তাদেরও পাল্লা ঐ পেশাওয়ার অবধি।'

এত জ্ঞান দান করেও সর্দারজীর আশ মিটল না। আমাকে শুধালেন, 'আপনি 'কাবুলীওয়ালা,' 'কাবুলীওয়ালা' বলেন কেন? কাবুলের লোক

www.MurchOna.com

হয় হবে 'কাবুলী,' নয় 'কাবুলওয়ালা।' 'কাবুলীওয়ালা' হয় কি করে ?'

হকচকিয়ে গেলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাবুলীওয়ালা।' গুরুকে বাঁচাই কি করে ? আর বাঁচাতে তো হবেই, কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

সামলে নিয়ে বললুম, এই আপনি যে রকম 'জওয়াহিরাত' বলেন। 'জওহর' হল এক বচন; 'জওয়াহির' বহুবচন। 'জওয়াহিরে' ফের 'আত' লাগিয়ে আরো বহুবচন হয় কি প্রকারে ?'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিন্তু মাছ দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিনা সে প্রশ্ন অন্য যে কোনো দেশে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু পাঠানমুল্লুকের আইন, এক খুনের বদলে আরেক খুন। তাই সে যাত্রা সর্দারজীর সামনে ইজ্জত বজায় রেখে ফাঁড়া কাটাতে পারলুম।

অবশ্য দরকার ছিল না। সর্দারজী তখন মোড় নিতে ব্যস্ত। আমি ভাবলুম, ম্যাপে দেখেছি জলালাবাদ থেকে কাবুল সোজা নাকবরাবর রাস্তা—গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন ?

বেতারবাণী হল, 'সেই ভালো, আজ যখন কিছুতেই কাবুল পেঁছন যাবে না, তখন নিমলার বাগানেই রাত কাটানো যাক।'

দূরে থেকেই সারি সারি চিনার গাছ চোখে পড়ল। সুপারির চেয়ে উঁচু—সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বুক অবধি ডালপাতা নেই, বাকীটুকু মসৃণ ঘন পল্লবে আন্দোলিত। আমাদের বাঁশপাতার সঙ্গে কচি অশথ-পাতার সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ বিনুনির মত যদি কোনো পল্লবের কল্পনা করা যায় তবে তাই হয় চিনারের পাতা। কিন্তু তার দেহটির সঙ্গে অন্য কোনো গাছের তুলনা হয় না। ইরানী কবিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তন্বঙ্গী তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা করে এখনো তৃপ্ত হয়নি। মৃদুমন্দ বাতাসে চিনার যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে মন্থরে আন্দোলিত করে, তখন রসকষহীন পাঠান পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বারে বারে তার দিকে তাকায়। সুপারির দোলের সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে কিন্তু সুপারির রঙ শ্যামলিমাহীন কর্কশ আর সমস্তক্ষণ ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ল।

মনে হয়, মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনো প্রাণী চিনারের দেহচ্ছন্দকে তরুণীর চেয়ে মধুর বলে স্বীকার করবে।

বেতারওয়ালা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো খবরই রাখেন না। সর্দারজীর কাছ থেকে বেশী আশা করাও অন্যায়, কিন্তু তিনিই বললেন নিমলার বাগান আর তাজমহলের বাগান নাকি একই সময়কার। নিমলার

www.MurchOna.com

বাগানে যে প্রাসাদ ছিল, সেটি অভিযান আক্রমণ সহ্য না করতে পেরে অদৃশ্য হয়েছে কিন্তু সারিবাঁধানো রমণীর চিনারগুলো নাকি শাহ-জাহানের হুকুমে পোঁতা। সর্দারজীর ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে অবশ্য উদ্ভিদবিদ্যা দিয়ে পরখ করে নেবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে শাহজাহানের তৈরী তাজের কনিষ্ঠ উদ্যানে ঢুকছি কল্পনা করাতে যে সুখ, উদ্ভিদতত্ত্বের মোহমুদ্গর দিয়ে সে মায়াজাল ছিন্ন করে কি এমন চরম মোক্ষলাভ! বাগানে আর এমন কিছু চারুশিল্পও নেই যার কৃতিত্ব শাহ জাহানকে দিয়ে দিলে অন্য কারো ভয়ংকর ক্ষতি হবে। আর এ কথাও তো সত্য যে, শাহজাহানের আসন উঁচু করার জন্য নিমলার বাগানের প্রয়োজন হয় না—এক তাজই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তবু স্বীকার করতে হবে, অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিরাম। চিনারের সারি, জল দিয়ে বাগান তাজা রাখবার জন্য মাঝখানে নালা আর অসংখ্য নরগিস ফুলের চারা। নরগিস ফুল দেখতে অনেকটা রজনীগন্ধার মত, চারা হুবহু একই রকম অর্থাৎ ট্যুব্‌রোজ জাতীয়। গ্রীক দেবতা নারসিসাস্ নাকি আপন রূপে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত দিন নদীর জলে আপন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেবতারা বিরক্ত হয়ে শেষটায় তাঁকে নদীর পারের ফুল গাছে পরিবর্তিত করে দিলেন। এখনো নারসিসাস্ ফুল—ফার্সীতে নরগিস্—ঠিক তেমনি নদীর জলে আপন ছায়ার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নরগিস্ বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পর ডাকবাঙলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলুকুল শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে, নাকমুখ ছাপিয়ে কোন্ অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলকুল শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্দ্রা টুটে যায়, এখানে তাই হল, কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে। এ সঙ্গীত বহুবার শুনেছি কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলোঅন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে নরগিসের পা ধুয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলুম নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল—

www.MurchOna.com

ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে—তারি পরশে নরগিস নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সঙ্গীতসৌরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল—পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

'এদিন আজি কোন ঘরে গা
খুলে দিল দ্বার,
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার ?'

## বার

ভোরের নমাজ শেষ হতেই সর্দারজী ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হল তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধ্যেয় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন।

বেতার-সায়েবের দিলও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সর্দারজীর সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকেও আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা কাজের খবর নানা রঙীন গুজব বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য, কতটা কল্পনা, কতটা ডাহা মিথ্যে বুঝবার মত তথ্য আমার কাছে ছিল না, কাজেই একতরফা গল্প জমে উঠল ভালোই। তারই একটা বলতে গিয়ে ভূমিকা দিলেন, 'সামান্য জিনিস মানুষের সমস্ত জীবনের ধারা কি রকম অন্য পথে নিয়ে ফেলতে পারে শুনুন !'

'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জন চল্লিশ কয়েদী আর তাদের পাহারাওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা দেখে একজন কি করে পালিয়েছে। পাহারাওয়ালাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদী নিয়ে বেরিয়েছিল জলালাবাদে যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কি শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল, ফাঁসি দেবে, কেউ বলল, গুলী করে মারবে, কেউ বলল, জ্যান্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবে সে বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না, আর আফগান জেলের অবস্থা আর কেউ জানুক না-জানুক তারা বিলক্ষণ জানত। একবার সে জেলে ঢুকলে সাধারণতঃ

www.MurchOna.com

কেউ আর বেরিয়ে আসে না—যদি আসে তবে সে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে অথবা অন্যের স্কন্ধের উপর সোয়ার হয়ে কফিনের ভিতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যে সব কথা শুনতে পাবেন তার বেশীর ভাগই কল্পনা—মরা লোকে তো আর কথা কয় না।

'তা সে যাই হোক, পাহারাওয়ালারা তো ভয়ে আধমরা। শেষটায় একজন বুদ্ধি বাৎলাল যে, রাস্তার যে-কোনো একটা লোককে ধরে নিয়ে হিসেবে গোঁজামিল দিতে।'

'পাছে অন্য লোকে জানতে পেরে যায় তাই তারা তাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল। চতুর্দিকে নজর, কাউকে যদি একাএকি পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবে। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে ধরে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সক্কলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।'

'সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের সকল রকম ভয় দেখিয়ে পাহারাওয়ালারা শাসিয়ে বলল, জলালাবাদের জেলর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, 'মা খু চিহ্‌ল্‌ ও পঞ্জম্‌ হস্তম্‌' অর্থাৎ 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।' ব্যস, আর কিছু না।

'লোকটা হয় আকাট মূর্খ ছিল, না হয় ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, অথবা এও হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে যদি কোন কয়েদী পালিয়ে যায়, তবে সক্কলের পয়লা রাস্তার যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারী নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়ত ভেবে নিয়েছিল রাস্তার যে-কোনো লোককে রাজার হাতী যখন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে তখন তাকে জেলখানায়ই বা নিয়ে যেতে পারবে না কেন?'

বেতারবাণী বললেন, 'গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনাগুলোর বর্ণনার বিশেষ ফেরফার হয় না কিন্তু ঐ হতভাগা কেন যে জলালাবাদের জেলরের সামনে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না সেই বিচিত্র।'

সর্দারজী শুধালেন, 'অন্য কয়েদীরাও চুপ করে রইল?'

বেতারওয়ালা বললেন, 'তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সব ক'টা কয়েদীই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে—অন্য সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অন্য সকলের যখন যড় ছিল তখন তারা কিছু বললে তো তাকে ধরিয়ে দেবারই সুবিধে করে দেওয়া হত।'

'তা সে যাই হোক, সেই হতভাগা তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়ে

www.MurchOna.com

চুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল কি বোকামিই সে করেছে। তখন একে ওকে বলে কয়ে আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জলালাবাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হুজুরের কাছে পেঁছিয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে সনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়ত তার কপালে আছে। অথবা হয়ত ভেবেছে, সমস্তটাই গাঁজা, কিম্বা ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মত এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

'জলালাবাদের জেলের ভিতরে কাগজ-কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক ঝুলোঝুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তারপর সে দরখাস্তের কি গতি হয় তার খবর পর্যন্ত বেচারীর কানে এসে পেঁছিয় না।

"বিশ্বাস করবেন না, এই করে করে এক মাস নয় দু'মাস নয়, এক বৎসর নয় দু'বৎসর নয়—ঝাড়া ষোলটি বৎসর কেটে গিয়েছে। তার তখন মনের অবস্থা কি হয়েছে বলা কঠিন, তবে আন্দাজ করা বোধ করি অন্যায় নয় যে, সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

'এমন সময় তামাম আফগানিস্থান জুড়ে খুব একটা খুশীর জশন (পরব) উপস্থিত হল—মুইন-উস-সুলতানের (যুবরাজের) শাদী অথবা তাঁর প্রথম ছেলে জন্মেছে। আমীর হবীবউল্লা খুশীর জোশে অনেক দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত রুখাসুখা জেলগুলোতেও পেঁছিল। শীতকাল; আমীর তখন জলালাবাদে। ফরমান বেরল, জলালাবাদের জেলর যেন তাবৎ কয়েদীকে হুজুরের সামনে হাজির করে। হুজুর তাঁর বেহদ মেহেরবানি ও মহব্বতের তোড়ে বে-এখতেয়ার হয়ে হুকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদীর ফরিয়াদ-তকলিফের খানাতল্লাশি করবেন।

'বিস্তর কয়েদী খালাস পেল, তারো বেশী কয়েদীর মিয়াদ কমিয়ে দেওয়া হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা হুজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'হুজুর শুধালেন, 'তু কীস্তী', 'তুই কে?'

'সে বলল, 'মা খু চিহ্ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম' অর্থাৎ আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

'হুজুর যতই তার নামধাম কসুরসাজার কথা জিজ্ঞাসা করেন সে ততই বলে সে শুধু পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। ঐ এক বুলি, এক জিগির। হুজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বুঝি পাগল। ঠাহর করবার জন্য অন্য নানা রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন দিকে

www.MurchOna.com

ওঠে, কোন্ দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, না ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

'ষোল বছর ঐ মন্ত্র জপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিনঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণ্য নেই, জেলের ভিতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই—তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তার সর্বৈব সত্তা ঐ এক মন্ত্রে, 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

'শত দোষ থাকলেও আমীর হবীবউল্লার একটা গুণ ছিল; কোনো জিনিসের খেই ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। শেষটায় সেই ডাকাতদের যে দু'-একজন তখনো বেঁচেছিল তারাই রহস্যের সমাধান করে দিল।

'শুনতে পাই খালাস পাওয়ার পরও, বাকী জীবন সে ঐ পঁয়তাল্লিশ নম্বরের ভানুমতী কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

গল্প শুনে আমার সর্ব শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিপক্ক বৃদ্ধ সর্দারজীর মুখে শুধু 'আল্লা মালিক,' 'খুদা বাঁচানেওয়ালা।'

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে হয় নিমলার কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

শিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছেন, দেরাদুন থেকে মুসৌরী, কিম্বা মহা-বলেশ্বরের কাছে পশ্চিম ঘাট উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে এ রকম রাস্তার চুলের কাঁটার বাঁক, হাঁসুলি চাকের মোড় কিছু নূতন নয়—নূতনত্বটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিঙ বানিয়ে দেয় না, হরেক রকম সাইনবোর্ড দুদিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না, বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দু' দিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি ধসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আষ্টেক ড্রাইভার আটকা পড়ে আপন আপন শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতমশায়ের 'রাধে গো ব্রজ-সুন্দরী, পার করো' বলা ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই। যাঁরা শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে রাস্তার বরফও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরফ সাফ করাতে আভিজাত্য আছে—শুনেছি স্বয়ং হুমায়ুন বাদশাহ নাকি শের শাহের তাড়া খেয়ে কাবুল না কান্দাহার যাবার পথে নিজ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ-নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ড্রাইভার অন্ততঃ এই সান্ত্বনা দেয় যে, দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনো ড্রাইভার এ রকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে কোনো

www.MurchOna.com

এক পাশে, হাজার ফুট গভীর খাদে দুর্ঘটনায় অপমৃত দুটো একটা মোটর গাড়ির কঙ্কাল। মনে পড়ছে কোন এক হিল-স্টেশনের চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলুম, ড্রাইভারদের বুকে যমদূতের ভয় জাগাবার জন্য রাস্তার কর্তাব্যক্তিরা একখানা ভাঙা মোটর ঝুলিয়ে রেখেছেন—নিচে বড় বড় হরপে লেখা, 'সাবধানে না চললে এই অবস্থা তোমারও হতে পারে।' কাবুলের রাস্তার মুখে সে রকম ব্যাপক কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না—চোখ খোলা রাখলে দুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাহাড়ের গা, আর একদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে রাস্তার ক্লিয়ারিঙ এক হাত। তার ভিতর দিয়ে নড়বড়ে উট দুরের কথা, শান্ত গাধাও পেরতে পারে না। চওড়া রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তখন গাড়িই ব্যাক করে চলে উল্টো দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়ু-বিহীন 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা' স্থিতধী মুনিপ্রবর আমি কখনো দেখিনি। সবাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না-থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে-চমকানিয়া। আস্তে আস্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে, তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা উট হঠাৎ আধপাক নিয়ে ফাঁকাটুকু চওড়াচওড়ি বন্ধ করে দেয়। পিছনের উটগুলো সঙ্গে সঙ্গে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঝামেলা লাগায়—স্রোতের জলে বাঁধ দিলে যে রকম জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাটানি করে, আর জন বিশেক পিছন থেকে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লাগায়। অবস্থাটা তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর আনাড়ি ড্রাইভার মোটর ঘোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যে রকম হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সেখানে হাজার ফুট গভীর খাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়ত রকে বসে বিড়ি হাতে আন্ডা-বাচ্চা নিয়ে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পিছন থেকে আর এক সারি উট এসে উপস্থিত হয় তবে দ'টার সম্পূর্ণ খোলতাই হয়। আধ মাইল ধরে, সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা-দক্ষিণের মেলার গোরুর হাট বসে যায়।

বুখারা-সমরকন্দ, শিরাজ-বদখশান সেই দ'য়ে মজে গিয়ে চিৎকার করে, গালাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সমবরণ করে, দু'দন্ড

www.MurchOna.com

জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে ঔড্র কায়দায় আরম্ভ করে—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি

'খ' রে খগ-আসনে মুরারি

'গ' রে গরুড়—

স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভিতর কনুয়ের উপর ভর করে দু' হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জটপাকানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কি করে খুলল, মোটর আবার কি করে চলল, একদম মনে নেই।

## তের

ফ্রান্সের বেতারবাণী আরম্ভ হয় 'ইসি পারি' অর্থাৎ 'হেথায় প্যারিস' দিয়ে। কাবুল ইয়োরোপীয় কোনো জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে আদর্শরূপে মেনে নেয় বলে কাবুল রেডিয়ো দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞতা-বাণী প্রচারিত করে 'ইন্ জা কাবুল' অর্থাৎ 'হেথায় কাবুল' বলে।

মোটরেও বেতারবাণী হল 'ইন্ জা কাবুল'। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অথবা কাবুলের যতটা দেখবার সুবিধা হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

হেডলাইটের জোরে কিছু যে দেখব তারও উপায় ছিল না। পূর্বেই বলেছি বাস্‌খানার মাত্র একটি চোখ—সাঁঝের পিদিম দেখাতে গিয়ে সর্দারজী তার উপর আবিষ্কার করলেন যে, সে চোখটিও খাইবারের রৌদ্রদাহনে গান্ধারীর চোখের মত কানা হয়ে গিয়েছে। সর্দারজীর নিজের জন্য অবশ্য বাসের কোনো চোখেরই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকানা। কিন্তু রাস্তার পঁয়তাল্লিশ নম্বরীদের উপকারের জন্য প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে একটা হারিকেন যোগাড় করা হল। হ্যান্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাড-গার্ডের উপর বসল।

আমি সভয়ে সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হারিকেনের সামান্য আলোতে আপনার মোটর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

সর্দারজী বললেন, 'হচ্ছে বই কি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোর চালাতে পারতুম।' মনে পড়ল, দেশের মাঝিরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সম্মুখে আলো রাখতে দেয় না।

www.MurchOna.com

কিন্তু 'ভাগ্য-বিধাতা' অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তো কবি তাঁরই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেড়ে দিয়ে গেয়েছেন—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক ঢের বেশী হুঁশিয়ার হয়। তাই বোধ হয় কবির হাতে রাষ্ট্রের কি দুরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালো মন্দ সব কবিকেই অবিচারে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

এ সব তত্ত্বচিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না। যদিও কাবুল উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে, তবু দুটো একটা মোড় সব সময়েই থাকার কথা। সে সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করছিলুম এবং সেই খবরটি সর্দারজীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ডর ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আম্মো চোখ বন্ধ করি।' শুনে আমি যা চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গান্ধারীর চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়।

সে যাত্রা যে কাবুলে পেঁাছতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, রগরগে উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না—ভ্রমণ-কাহিনী লেখকের জীবনেও সেই সূত্র প্রযোজ্য।

'গুমরুক' বা কাস্টম-হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—বিছানাখানা পর্যন্ত ছাড়ল না। টাঙ্গা নিয়ে ফরাসী রাজদূতাবাসের দিকে রওয়ানা হলুম—কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফার্সীর অধ্যাপক ছিলেন ও তখন ফরাসী রাজদূতাবাসে কর্ম করতেন।

টাঙ্গা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কো রেডিয়ো কোন্ ভরসায় তাবৎ দুনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করে। দেখলুম, কাবুল শহরেও আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙ্গাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালার কোনো তফাত নেই। আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য শেয়ালদার কাপ্তেনদের মত তখনি স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়েজিলেন ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়, সেও বার বার 'চশ্‌ম', 'বস্‌র্ ও চশ্‌ম্' অর্থাৎ 'আমার মাথার দিব্যি, আপনার তালিম এবং হুকুম আমার

www.MurchOna.com

চোখের জ্যোতির ন্যায় মূল্যবান' ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দু'মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে আকাট মূর্খকে জিজ্ঞাসা করে ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। এক গুণী শেষটায় বললেন—'ফরাসী রাজদূতাবাস ? সে তো প্যারিসে। যেতে হলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বোমবাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙ্গাওয়ালা পেশোয়ার অথবা কান্দাহার—যেটা কাছে পড়ে। সেখান থেকে বোমবাই।'

টাঙ্গাওয়ালা ঘড়েল। বুঝল,

'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো'

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর-আরা হয়ে ফরাসী রাজদূতাবাস পেঁছিল। কাবুল শহর ছোট—কম করে তিনবার সে আমাকে ঐ রাস্তা দিয়ে আগেই নিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে পাহাড়—এর চেয়ে প্যাঁচালো কেপ অব্ গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফার্সী সে বুঝতে পারে না। এবার আমার পালা। ভাড়া দেবার সময় সে যতই নানারকম যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে আমি ততই বোকার মত তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাই আর একঘেয়ে আলোচনায় নূতনত্ব আনবার জন্য তার খোলা হাত থেকে আমারই দেওয়া দু'চার আনা কমিয়ে নিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঙ্গা ফার্সীকে একদম ক্ষুদ্র বানিয়ে দিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলি, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ইমানদার লোক, বিদেশী বলে না জেনে বেশী দিয়ে ফেলেছি, অত বেশী নিতে চাও না। মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন, তোমার বেটাবেটির—'

পয়সা সরালেই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, আল্লা রসুলের দোহাই কাড়ে, আর ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদী-রুমীর বয়েৎ আওড়ায়। এমন সময় অধ্যাপক বগদানফ এসে সব কিছু রফারফি করে দিলেন।

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শুধালো, 'আপনার দেশ কোথায় ?'

বুঝলুম, গয়ার পান্ডার মত। ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য।

কে বলে বাঙালী হীন ? আমরা হেলায় লঙ্কা করিনি জয় ?

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা। সমস্ত

www.MurchOna.com

রাত ধরে পড়াশোনা করেন, আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষের সব পাখির মধ্যে পেঁচাকে পছন্দ করতেন বেশী। শান্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটায় ক্লাশ নিতেন, নন্দবাবু, তারই দেয়ালে একটা পেঁচা এঁকে দিয়েছিলেন। বগদানফ সায়েব তাতে ভারি খুশী হয়ে নন্দবাবুর মেলা তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ও কট্টর জারপন্থী। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় মস্কো থেকে পালিয়ে আজরবাইজান হয়ে তেহরান পেঁাছান। সেখান থেকে বসরা হয়ে বোম্বাই এসে বাসা বাঁধেন। ভালো পেহলেভী বা পহ্লবী জানতেন বলে বোম্বায়ের জরথুস্ত্রী কামা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিয়ে সেখানে অনেক পুঁথিপত্রের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে রুশ পন্ডিতদের দুরবস্থায় সাহায্য করবার জন্য এক আন্তর্জাতিক আহ্বানে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাড়া দেন এবং বোম্বাইয়ে বগদানফের সঙ্গে দেখা হলে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ফার্সীর অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭ সালের পূর্বে বাগদানফ রুশের পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষ্যে তেহরানে আট বৎসর কাটিয়ে অতি উৎকৃষ্ট ফার্সী শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তীকালে ইরান যান, তখন সেখানে ফার্সীর জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পন্ডিতেরা বলেন যে, ফার্সী পড়াবার জন্য বগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের অন্য জহুরীদের মুখেও আমি শুনেছি যে, আধুনিক ফার্সী সাহিত্যে বগদানফের লিখনশৈলী আপন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

ইউরোপীয় বহু ভাষা তো জানতেনই—তাছাড়া জগতাই, উসমানলী প্রভৃতি কতকগুলো অজানা অচেনা তুর্কী ভাষা উপভাষায় 'জবরদস্ত মৌলবী' ও ছিলেন। কাবুলের মত জগাখিচুড়ি শহরের দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গেই তিনি তাঁদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে অগাধ পান্ডিত্য, অন্যদিকে কুসংস্কারে ভর্তি। বা দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন, না তো গোখরোর ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই 'দুর্ঘটনা'র তিন মাস পরেও যদি তাঁর পেয়ারা বেরাল বমি করে, তবে ঐ বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অপয়া চাঁদ দেখাই তার জন্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আরশি ভেঙে গিয়েছে, চাবির গোছা ভুলে মেজের উপর রেখেছিলে—আর যাবে

www.MurchOna.com

কোথায়, সে রাত্রে বগদানফ সাহেব তোমার জন্য এক ঘন্টা ধরে আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন, গ্রীক অর্থডক্স চার্চের তাবৎ সেন্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন, পরদিন ভোরবেলা তোমার চোখে মুখে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে তিন বৎসর ধরে অপেক্ষা করবেন তোমার কাছ থেকে কোনো দুঃসংবাদ পাবার জন্য। তিন বছর দীর্ঘ মিয়াদ, কিছু-না-কিছু একটা ঘটবেই। তখন বাড়ি বয়ে এসে বগদানফ সায়েব তোমার সামনে মাথা নিচু করে জানুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ঐ এক কথা 'বলিনি, তখন বলিনি ?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারই উপরে বসে বিনা মেহন্নতে ভবনদী পার হয়ে ভেসে যায়।'

বগদানফের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে দুনিয়ার কুল্লে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে, এক মাসের ভিতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, দু'মাসের ভিতর দেখতে পাবেন, বগদানফ-কাঠের গুঁড়িতে আপনি একা নন, আপনার এবং সায়েবের পরিচিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। ঘোর বেলেল্লা দু'-একটা নাস্তিকের কথা অবিশ্যি আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসীর কানা মারে।

দয়ালু, বন্ধুবৎসল ও সদানন্দ পুরুষ। তার মুক্ত হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'ইল্ আশেৎ লে মাশিন আ পেসে লে মাকারনি।' অর্থাৎ 'মাকারনি' ফুটো করার জন্য তিনি মেশিন কেনেন।' সোজা বাঙলায় 'কাকের ছানা কেনেন'।

কাবুলের বিদেশী দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল ছিলেন বগদানফ সায়েব—একটি আস্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল।

## চৌদ্দ

এক বৃদ্ধা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পালা-পরবে নেমন্তন্ন পেলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তারপর বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তাহলে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম; সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সক্কলের কাছ থেকে একই গালাগাল, এতদিন ধরে বিয়ে দাওনি কেন ?'

দেশভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার

www.MurchOna.com

ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না। যদি না দাও তবে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম, না, মন্দ করলুম। যদি দাও তবে লোকের গালাগাল নিশ্চিত খেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্থানের বেলা, কারণ, অরক্ষণীয়া কন্যার যে রকম বিয়ে হয়নি, আফগানিস্থানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পোঁতা আছে সে দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ-মহাভারতে। আফগানিস্থান গরীব দেশ, ইতিহাস গড়ার জন্য মাটি ভাঙবার ফুরসৎ আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মোন-জো-দড়ো বের করার জন্য নয়—কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি করার মত পাণ্ডিত্য কাবুলীর এখনো হয়নি—আমাদেরই কতটা হয়েছে কে জানে ? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস-পাগলাদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস তারই মীমাংসা করতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়।

আফগানিস্থানের অর্বাচীন ইতিহাস নানা ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে এদেশে ওদেশে, অন্ততঃ চারখানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করেছেন—মাহমুদ, বাবুরের ভিতর দিয়ে ভারত-বর্ষের পাঠান-তুর্কী-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য। কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পণ্ডিত—আফ-গানের কথাই ওঠে না—কাবুল হিন্দুকুশ, বদখশান্, বলখ, মৈমানা হিরাতে ঘোরাঘুরি করেননি কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উদ্ব্যস্ত হয়নি। অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্থানের ইতিহাস না লিখে ভারত-ইতিহাস লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠান্ডা রাখবার কোনো মধ্যমনারায়ণ নেই।

গোদের উপর আরেক বিষ-ফোঁড়া—আফগানিস্থানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ বল্‌খ্-বদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমুদরিয়ার (গ্রীক অক্সুস, সংস্কৃত বক্ষু) ওপারের তুর্কীস্থানের সঙ্গে, পশ্চিমভাগ অর্থাৎ হিরাত অঞ্চল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা যুগে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্থানের তুলনায় সুইটজারল্যান্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা—যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ে কারবার।

আর শেষ বিপদ, যে দু'চারখানা কেতাব-পত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রামদা উঁচিয়ে আছেন। 'গান্ধার' লিখেই সেই রামদা—'?'—উঁচিয়েছেন অর্থাৎ 'গান্ধার কোথায় ?' 'কাম্বোজ'

www.MurchOna.com

বলেই সেই খড়্গ—'?'—অর্থাৎ 'কাম্বোজ বলতে কি বোঝো—?' 'কম্বুকণ্ঠী' বা 'কম্বুগ্রীব' বলতে বোঝায় যার গলায় শাঁখের গায়ের তিনটে দাগ কাটা রয়েছে—যেমনতর বুদ্ধের গলায়। কম্বোজ দেশ কি তবে গিরি উপত্যকার কণ্ঠী-ঝোলানো দেশ আফগানিস্থান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্র-পারের দেশ বেলুচিস্থান? এমন কি দেশগুলোর নামের পর্যন্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন বল্‌খ্‌—কখনো বল্‌হিকা, কখনো বাল্‌হিকা, কখনো বাল্‌হীকা। সে কি তবে ফেরদৌসী উল্লিখিত বল্‌খ্‌—যেখানে জরথুস্ত্র রাজা গুশ্‌ৎআস্‌প্‌কে আবেস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? সেখান থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলীরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে? কারণ ঐ দুয়ের নামই তো সংস্কৃতে বাল্‌হিকম্‌।

রাসেল বলেছেন, 'পন্ডিতজন যে স্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন, মূর্খে যেন তথায় ভাষণ না করে।'

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস—আমার মনে হয় ঠিক ঐ জায়গায়ই তার কিছু বলার সুযোগ—পন্ডিতরা তখন একজোট হতে পারেন না বলে সে বারোয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পন্ডিতে মূর্খে মিলে আফগানিস্থান সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মোটামুটি তত্ত্ব এই—

আর্যজাতি আফগানিস্থান, খাইবার পাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—পামির, দার্দিস্থান বা পৈশাচভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়। বোগাজ-কোই বর্ণিত মিতানি রাজ্য ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগান কিংবদন্তী যে আফগানরা ইহুদীদের অন্যতম পথভ্রষ্ট উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তী দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্র নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখেই বোধ করি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবতীরূপে কল্পনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের ষোলটি রাজ্যের নির্ঘন্টে গান্ধার ও কাম্বোজের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পন্ডিতেরা সেই রামদা দেখান।

এ-যুগে এবং তারপরও বহুযুগ পরে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে-রকম কোনো সীমান্তরেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্যের মধ্যে কোনো সীমান্তভূমি ছিল না। বক্ষু বা আমুদরিয়ার উভয় পারের দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে

www.MurchOna.com

ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরানী সাহিত্যে তাকে আবার ইরানের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর ইরানী রাজা সায়েরাস (কুরশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্থান দখল করে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিকন্দর শাহের সিন্ধুদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ও পশ্চিম-সিন্ধু ইরানের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর-আফগানিস্থান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তাঁর প্রধান সৈন্যদল খাইবারপাস হয়ে পেশাওয়ারে পেঁছিয়। খাইবার পেরোবার সময় সীমান্তের পার্বত্য জাতি পাহাড়ের চূড়াতে বসে সিকন্দরী সৈন্যদলকে এতই উদ্ব্যস্ত করেছিল যে গ্রীক সেনাপতি তাদের শহর গ্রাম জ্বালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দরের সিন্ধুজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে-রকম জোর দাগ কেটে গিয়েছে, তেমনি গ্রীক অধিকারের ফলে আফগানিস্থান ও ভৌগোলিক আরিয়া, আরাখোসিয়া, গেদ্রোসিয়া, পারোপানিসোদাই ও দ্রাঙ্গিয়ানা অর্থাৎ হিরাত, বল্‌খ, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ নিতে আরম্ভ করে।

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষ দখল করে গ্রীকদের মুখোমুখি হন—ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বাল্‌হিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্থান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ভারত-বর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বেদ ও ইরানী আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে এক দিকে যেমন বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়, অন্যদিকে তেমনি ইরানী ও গ্রীক ভাস্কর শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়-স্তম্ভের মসৃণতা ইরানী ও তার রসবস্তু গ্রীক। সে-যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় কলার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার আকার রূঢ়, গতি পঙ্কিল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মাধ্যন্তিক নামক শ্রমণকে আফ-গানিস্থানে পাঠান। সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্থানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। দুই শতাব্দীর ভিতরেই আফগানিস্থানের বহু গ্রীক সিথিয়ান ও তুর্ক বুদ্ধের শরণ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বেদ-আবেস্তার ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে।

www.MurchOna.com

উত্তর-আফগানিস্থানের বল্‌খ্‌ প্রদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগে গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বল্‌খ্‌ অঞ্চলের গ্রীকদের ভিতর অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয় ও বল্‌খের গ্রীকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তারপর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদের একজন রাজা মেনান্দের (পালি ধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্হোর' রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (আধুনিক) করাচী পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্থান তথা পশ্চিম-ভারতের গ্রীক রাজাদের কোনো ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকের তৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে জানেন। কাবুল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেগ্রাম উপত্যকায় এঁদের তৈরী হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বছর মাটির তলা থেকে বেরোয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০ রাজ্যকালের ভিতর অন্তত ঊনত্রিশজন রাজা ও তিনজন রাণীর নাম চিহ্নিত মুদ্রা এ-যাবৎ পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রীক ও খরোষ্ঠী এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রীক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজরাণীর নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজায় রাজায় বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কিন্তু আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতের যোগসূত্র অটুট ছিল।

আবার দুর্যোগ উপস্থিত হল। আমুদরিয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়েচিদের হাতে পরাজিত হয়ে আফগানিস্থান ছেয়ে ফেলল। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ পশ্চিম দু'দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে শকদ্বীপ ও ইরানীতে সকস্তান হয়। বর্বর শকেরা ইরানী, গ্রীক ও ভারতীয়দের সংস্রবে এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্থানের ইতিহাসে তারা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইন্দো-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্ধফারনেস্‌ নাকি যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য সেন্ট টমাসের হাতে খ্রীষ্টান হন। কিন্তু এই সেন্ট টমাসের হাতেই নাকি আবিসিনিয়াবাসী হাবশীরাও খ্রীষ্টান হয় ও এঁরই কাছে মালাবার ও তামিলনাড়ের হিন্দুরাও নাকি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েক মাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর সেন্ট টমাসের কবর দেখানো হয়। কাজেই আফগানিস্থানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বোধ করি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কুষণ সম্রাটদের ইতিহাস ভারতে অজানা নয়। কুষণ বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরানী পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্থান দখল

www.MurchOna.com

করেন। কনিষ্ক পশ্চিমে ইরান-সীমান্ত ও উত্তরে কাশগড় খোটান, ইয়ারকন্দ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরে কনিষ্ক যে স্তূপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহাস্থি রক্ষা করেন, তার জন্য তিনি গ্রীক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে-শিল্পী ভারতীয় গ্রীক না আফগান গ্রীক বলা কঠিন—দরকারও নেই—কারণ পশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে তখনো সংস্কৃতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

যে-স্তূপে কনিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। জলালাবাদে যে অসংখ্য স্তূপ এখনো খোলা হয়নি তারই একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তাহলে আফগান ঐতিহাসিকেরা (?) আশ্চর্য হবেন না। কনিষ্ককে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয়, তাহলে তাঁকে আফগান রাজা বলতেও কোনো আপত্তি নেই। ধর্মের কথা এখানে অবান্তর—কনিষ্ক বৌদ্ধ হওয়ার বহুপূর্বেই আফগানিস্থান তথাগতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুষণ-রাজ্য পতনের পরও আফগানিস্থানে কিদার কুষণগণ দু'শ' বছর রাজত্ব করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার যৌবনমধ্যাহ্ন আফগানিস্থান ও পূর্ব তুর্কীস্থানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে স্বপ্রকাশ। গুপ্তযুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কখনো কখনো গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে—যেদিন বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে সেদিন জানব যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, পরবর্তী যুগে তা আর কখনো সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্থানের ভূগর্ভ থেকে যেমন গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বেরোবে, সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের চারুকলার ইতিহাস লেখা হয়ে ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য করবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত-সম্রাটদের সুশাসনে সনাতনধর্ম বৈষ্ণব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, আফগানিস্থান তখনো বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মত গুপ্তরা আফগানিস্থান জয় করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আফগানিস্থানে পরবর্তী যুগের শক শাসনপতিগণ হীনবল। পঞ্চম শতকের চীন পর্যটক ফা-হিয়েন কাবুল থাইবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার

www.MurchOna.com

সাহস করেননি, খুব সম্ভব আফগান সীমান্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরের অনেক কঠিন রাস্তা পামির কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষ পেঁছান।

তারপর বর্বর হূণ অভিযান ঠেকাতে গিয়ে ইরানের রাজা ফিরোজ প্রাণ দেন। হূণ অভিযান আফগানিস্থানের বহু মঠ ধ্বংস করে ভারত-বর্ষে পেঁছয়—গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাদের যে সব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হূণ এবং আফগানদের সংমিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের সূত্রপাত।

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তাশকন্দ সমরকন্দ হয়ে, আমুদিয়া অতিক্রম করে কাবুল পেঁছন। কাবুল তখন কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ। ততদিনে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পেঁছেছিল। শান্ত ভারতবাসীই যখন বেশীদিন বৌদ্ধধর্ম সইতে পারল না তখন দুর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীবে দয়ার বাণী বলে মেনে চলতে কষ্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার গজনী কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাঁদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্থানে এসে পেঁছয় তখন সে-দেশ কনিষ্কের বংশধর তুর্কী রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রাহ্মণ্য রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিন-লয়েস কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন—শেষ রাজা ত্রিলোচন পাল গজনীর সুলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্থানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকী ইতিহাস কাশ্মীরে। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁদের বর্ণনা আছে।

এখানে এসে ভারতীয় পন্ডিতগণ এক প্রকান্ড ঢেরা কাটেন। আমি পন্ডিত নই, আমার মনে হয় তার কোনোই কারণ নেই। প্রথম আর্য অভিযানের সময়—কিম্বা তারও পূর্ব থেকে—আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ নানা যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করেছে। যদি বলা হয় আফগানরা মুসলমান হয়ে গেল বলে তাদের অন্য ইতিহাস, তাহলে বলি, তারা একদিন অগ্নি-উপাসনা করেছিল, গ্রীক দেবদেবীর পূজা করেছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন দুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বুদ্ধের শরণ নিয়ে কাবুলী যখন মগধবাসী হয়নি, তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্থান—

www.MurchOna.com

বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জলালাবাদ—বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বান্নু, কোহাট এমন কি পাঞ্জাবও বাদ দিতে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায়? যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ-গজনীর পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতি যুগে নানা ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি চোরাবালির উপর তো আর ইতিহাসের তাজমহল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বীরূনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বীরূনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল-বীরূনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনো মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শণ, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরূনী ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন—প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারশীকুহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবী ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পান্ডিত্য দেখাতে পারেননি। এই বিংশ শতকেই ক'টি লোক সংস্কৃত আরবী দুই-ই জানেন আঙুলে গুণে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান তুর্কী সম্রাটেরা আফগানিস্থানের দিকে ফিরেও তাকাননি, কিন্তু আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমীর খুসরু ফার্সীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ শোনেননি, কিন্তু কাবুল কান্দাহারে আজকের দিনেও তাঁর প্রতিপত্তি হাজিফ-সাদীর চেয়ে কম নয়। 'ইশকিয়া' কাব্যে দেবল দেবী ও খিজর খানের প্রেমের কাহিনী পড়েননি এমন শিক্ষিত মৌলবী আফগানিস্থানে আজও বিরল।

আফগানিস্থান—বিশেষ করে গজনীর—দৌত্যে উত্তর-ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষা তার সাহিত্য সম্পদ, বাইজনটাইন সেরাসীন ইরানী স্থাপত্য, ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি, ইউনানী ভেষজবিজ্ঞান, আরবী-ফার্সী শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে, নূতন নূতন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে

www.MurchOna.com

চলল। একদিন আফগানিস্থান গ্রীক ও ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার-কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান-তুর্কী যুগে সেই আফগানিস্থান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

তারপর তৈমুরের অভিযান।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের হিরাত অতি সহজেই তুর্কীস্থানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ-রুখ চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানীদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চারুকলার পত্তন করেন। তৈমুরের পুত্রবধূ গৌহর শাদ শিক্ষাদীক্ষায় রানী এলিজাবেথ, ক্যাথরিনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁর আপন অর্থে তৈরী মসজিদ-মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেননি। এখনো আফগানিস্থানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ঐ হিরাতে—যে কয়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সত্ত্বেও এখনো বেঁচে আছে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় মধ্য-এশিয়ার সর্বকলা শিল্প কী আশ্চর্য প্রাণবলে সম্মিলিত হয়ে এই অনুর্বর দেশে কী অপূর্ব মরূদ্যান সৃষ্টি করেছিল।

অল-বীরুনীর পর গৌহর শাদ, তারপর বাবুর বাদশাহ।

শ্বেতাঙ্গ পন্ডিতের নির্লজ্জ জাত্যাভিমানের চূড়ান্ত প্রকাশ হয় যখন সে বাবুরের আত্মজীবনী অপেক্ষা জুলিয়াস সীজারের আত্মজীবনীর বেশী প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক।

আফগানিস্থান ভ্রমণে যাবার সময় একখানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট—সে-বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কান্দাহার গজনী কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্থানের বিশেষ তফাত নেই।

বাবুর ফরগনার রাজা নন, আফগানিস্থানের শাহানশাহ নন, দিল্লীর সম্রাটও নন। আত্মজীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এসবের অতীত অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্থানের নববর্ষার প্রথম দিনে তিনি আনন্দে অধীর, জলালাবাদের আখ খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সেই আখ আপন দেশ ফরগনায় পৌঁতবার জন্য টবে করে হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে চালান করেছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাত থেকে গৌহর শাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা টবে করে নিয়ে এসে দিল্লীতে পুঁতে ভাবছেন এর ভবিষ্যৎ কি, এ তরু মঞ্জরিত হবে তো ?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাবুর ভারতবর্ষ ভালোবাসেননি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে

www.MurchOna.com

বুঝতে পেরেছিলেন, ফরগনা কাবুলের লোভে যে বিজয়ী বীর দিল্লীর তখ্‌ৎ ত্যাগ করে সে মূর্খ। দিল্লীতে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনা করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাবুলে পাঠাবার হুকুম দিলেন মরবার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মত কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব। নব মৌর্য সাম্রাজ্য।

নাদির উত্তর-ভারতবর্ষ লন্ডভন্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্থানে নিহত হন। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালীর (সাদদো-জাই দুররানী) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ সালের সমস্ত আফগানিস্থান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৬১ সালে পানিপথ। ১৭৯৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতিমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে তান্ডবলীলা আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানিস্থানের ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতের মানুষ দেখা দিল যে এই দুই দেশের কোনো দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এ যেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্থান জয় করে রাজ্য স্থাপনা করার চেষ্টা করেছে, নয় আফগান সিংহাসনে আপন পুতুল বসিয়ে রুশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্থান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত 'কাফির' ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোল্লার অজ্ঞতা তার পাহাড়েরই মত উঁচু, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমীর দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজকে দোস্তী দেখিয়েছিলেন। তার চরম সৌভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমীর হাবীবউল্লাকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারেননি।

কিন্তু তিন বারের বার বেল টাকে পড়ল। আমানউল্লা ইংরেজকে সামান্য উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধ হয় কাবুলীরা বলে, 'খুদা-দাদ' আফগানিস্থান অর্থাৎ 'বিধিদত্ত' আফগানিস্থান।

জিন্দাবাদ খুদা-দাদ আফগানিস্থান!

www.MurchOna.com

## পনর

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসী। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম আবদুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে—জুতো বুরুশ থেকে খুন খারাবি।' অর্থাৎ ইনি 'হরফন-মৌলা' বা 'সকল কাজের কাজী।'

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো-না কোনো মন্ত্রীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান—দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম—ছ'ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেবে এসে আঙুলগুলো দু'কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙ্গি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হত, তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্থানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ—হাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-খেবড়ো নাক—কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার-প্রকার ঠাহর হল না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে—কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াস্‌কিট্‌।

চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনের

www.MurchOna.com

দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্থানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মত রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মত আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হদীসের সন্ধানে মগজ আতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?'

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান—হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দন্ডেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ, দ্য কুইজিন, ফাই-ফরমাস-বরদার তিনেক্কোতিন হয়ে একরারনামা পেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল, তার অর্থ, 'আমর চশম্, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। এক মাস হল খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার?'

একগাল হাসল।

'কি কি রাঁধতে জানো?'

'পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা—।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরী করার কল আছে?'

'কিসের কল?'

আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোত্থেকে?'

বলল, 'কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বরফ আনতে ঐ উঁচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড় বড় গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম, খবর-টবর ও রাখে। বললুম, 'তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসন-

www.MurchOna.com

কোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো। রাত্তিরের রান্না আজ আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরের রান্না কোরো। সকালবেলা চা দিয়ো।'

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা—মৃদুমধুর ঠান্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পেঁছিব। পথে দেখি এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল—একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হত।'

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে মোট কাবুলে বইতে যাবে কে ?

আমি বললুম, 'দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকান্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-নুন-লকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাত্রে বাড়িতেই খাবেন।' যেভাবে বলল, তাতে অচীন দেশের নির্জন রাস্তায় গাঁইগুই করা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। 'হাঁ হাঁ, হবে হবে' বলে কি হবে ভালো করে না বুঝিয়ে হনহন করে কাবুলের দিকে চললুম।

খুব বেশী দূর যেতে হল না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পেঁছতে না পেঁছতেই দেখি মসিয়ে জিরার টাঙ্গা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস্ হিসাবে আমাকে তিনি বেশ দু'-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।'

বস্‌কে খুশী করবার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানীর কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্ধ তাঁরই পাশে বসে 'উই' সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ, অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্টেনলি, এভিডেন্টলি', বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলন্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আঁতাৎ হয়ে ছিল; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি-নিত্যি, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তমব্বীতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে হুট করে বেরিয়ে গেল।

www.MurchOna.com

তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। দেখি আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা-টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আগা আবদুর রহমান এককালে মিলিটারী মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুমব্বার মাংস—তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামীকাবাব। বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটি আস্ত মুর্গি-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভয় বাণী দিল—রান্না ঘরে আরো আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ'জনের রান্না পরিবেশন করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে তখন আর কি করার থাকে ? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার উপর অদ্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও ডাক্তারী কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে গড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'ব্যস ! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবদুর রহমান—।'

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয় জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর নিয়ে—পেঁজা বরফের গুঁড়ায় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কি ?'

www.MurchOna.com

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নিচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগেবালার বরকী আঙুর—তামাম আফগানিস্থানে মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘষে—মেয়েরা যে রকম আচারের জন্য কাগজী নেবু পাথরের শিলে ঘ'ষেন। বুঝলুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলায়েম কায়দা। ওদিকে তালু আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলী তাই খাইবারপাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশীক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুয়ো। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজসরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলী সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম তৃতীয়, চতুর্থ—কাবুলীরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবিশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি ?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন ?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা মিলিয়ে দেখো দিকিনি—তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর ?'

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

www.MurchOna.com

তারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গালানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়—আতসবাজির হল্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই বা কি করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর কখনো পানশির গিয়েছেন ?,

'সে আবার কোথায় ?'

'উত্তর-আফগানিস্থান। আমার দেশ—সে কী জায়গা ! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজী ঘোড়ার সঙ্গে বাজী রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে ! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কি আরাম ! লোহার বারকোশে আঙার জ্বালিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানলার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—দু'দিন, তিন দিন, পাঁচদিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ—কি রকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানলার কাছে বসে থাকব ?'

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করুণ ভাবে তাকালো যে, মনে হল এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, 'একবার আসুন, জানলার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

খেই তুলে নিয়ে বলল, 'সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মত, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনো ঘুরঘুট্টি ঘন,—চাদরের মত নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,—প্রচন্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায় —হু হু করে কখনো একমুখো হয়ে তাজী ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ—ওঁ—ওঁ

www.MurchOna.com

—তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের এঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে ছ'হাত উঁচু বরফের কমবল—গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কমবলের মত ওম্ দেয়। তার তলায় মানুষকে দুদিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে—সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরত্তি ধুলো নেই, বালু নেই, ময়লা নেই। ছুরির মত ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে—দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে—এক একবার দম ফেলাতে এক শ'টা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

'তখন ফিরে এসে, হুজুর একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন তবে আমি আমার গোঁফ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আদায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আবদুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড় খুশীর বাৎ হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশীর জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।'

আবদুর রহমান ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

আমি বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানলার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে ?'

## ষোল

শো' কেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল, জিনিসটা কোন্ কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেই রকম, বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা পরে হাত ধোয়ার ভারি সুবিধে। হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ধোওয়া হল।'

www.MurchOna.com

কুঁড়ে লোকের যদি কখনো শখ হয় যে সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ হয় তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা কাবুলের সংকীর্ণ উপত্যকায়। কারণ কাবুলে দেখবার মত কোনো বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরবার পর যদি কোনো সবজান্তা আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'দেহ-আফগানান যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিশেছে তার পিছনের ভাঙা মসজিদের মেহরাবের বাঁ দিকে চেনমতিফে ঝোলানো মেডালিওনেতে আপনি পদ্মফুলের প্রভাব দেখেছেন?' তাহলে আপনি অম্লান বদনে বলতে পারেন 'না' কারণ ও রকম পুরোনো কোনো মসজিদ কাবুলে নেই।

তবু যদি সেই সবজান্তা ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারীর আমির পালিয়ে আসার সময় যে ইরানী তসবিরের বান্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরীন কলম ওস্তাদ বিহজাদের আঁকা সমরকন্দের পোলো খেলার ছবি দেখেছেন?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না' কারণ কাবুল শহরে ওরকম কোনো তসবিরের বান্ডিল নেই।

পন্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আস্তাবলে সিকন্দর শাহের ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেখানে এখন হয়ত বেগুন ফলছে। পন্ডিতরা কম্পাস নিয়ে তার নিশানা লাগাতে পারলে আনন্দে বিহ্বল। কোথায় এক টুকরো পাথর বুদ্ধের কোঁকড়া চুলের আড়াই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায় হাতের তেলোর মত পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পন্ডিত পঞ্চমুখ—পাড়া অতিষ্ঠ করে তোলেন। এঁদের কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণ পাঁচজনের কথা বলছি, যারা দিল্লী আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুকে চমক লাগাবার মত রসবস্তু কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পৌঁছে কাউকে তুর্কীনাচের চর্কিবাজি খেতে হয় না। পাথরকাটা রোদ্দুরে শুধু পায়ে শান বাঁধানো ছ'ফার্লেঙী চত্বর ঘণ্টাতে হয় না, নাকে মুখে চামচিকে বাদুড়ের থাবড়া খেয়ে খেয়ে প'চা বোঁটকা গন্ধে আধা ভিরমি গিয়ে মিনার-শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মত দিব্যি হাত ধোওয়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মনোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধবের কেউ না কেউ কোনো একটা বাগানে সমস্ত দিন কাটাবার জন্য একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই—হেঁটে, টাঙ্গায়, মোটরে যে কোনো কৌশলে যাওয়া যায়।

www.MurchOna.com

তিন দিকে উঁচু দেওয়াল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা পুকুরের মত শান্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতির গাছ, নরগিস্ ফুলের চারা, আর ঘন সবুজ ঘাস। কার্পেট বানাবার অনুপ্রেরণা মানুষ নিশ্চয় এই ঘাসের থেকেই পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাসের উপর ইয়ার-বক্সী ভালো ভালো কার্পেট পেতে গাব্দাগোব্দা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবেন। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন।

দীর্ঘ তম্বঙ্গী চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন আসমানী ফিরোজা আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবুল পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের হুটোপুটি। কিম্বা দেখবেন হুটোপুটি নয়, এক পাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশংকর জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কোমর বেঁধে প্ল্যানমাফিক একজন আরেকজনের পিছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চূড়ো পেরিয়ে ওদিকে চলে যাবার তাদের মতলব। ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটে চড়ার পর কোন্ এক অদৃশ্য নন্দীর ত্রিশূলে ঘা খেয়ে নেমে আসছে, আবার এগচ্ছে, আবার ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর আলাদা ট্যাক্টিক চালাবার জন্য দু'তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকুল এক হয়ে গিয়ে নূতন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেক দল মেঘের চূড়োয় পৌঁছতে পেরে খানিকটা মাথা দেখিয়ে এদের যেন লজ্জা দিয়ে আড়ালে ডুব মারবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সব কিছু ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে অতি ঊর্ধ্বে আপনারই মত নীল গালচের শুয়ে একখানা টুকরো মেঘ অতি শান্ত নয়নে নিচের মেঘের গৌরীশংকর-অভিযান দেখছে —আপনারই মত। ওকে 'মেঘদূত' করে হিন্দুস্থান পাঠাবার জো নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুরশাহের আমল থেকে সে ঐখানে শুয়ে আছে, আর কোথাও যাবার মতলব নেই। পানশিরের আবদুর রহমান এরই কাছ থেকে চুপ করে বসে থাকার কায়দাটা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে নানা অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীষ্মের অন্তিম নিঃশ্বাস হয়, তবে তাতে আরো মেশানো আছে পাকা আপেল, অ্যাপ্রি-কটের বাসী বাসী গন্ধ। তিন পাঁচিলের বন্ধ হাওয়াতে সে গন্ধ পচে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি নেশার আমেজ লাগায়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে—তখন শুনতে পাবেন উপরের হাওয়ার দোলে তরু পল্লবের মর্মর আর নাম-না-জানা পাখির জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ত কূজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে কোর্মা-পোলাও রান্নার ভারী খুশবাই। চোখে তন্দ্রা, জিভে

www.MurchOna.com

জল। দ্বন্দ্বের সমাধান হবে হঠাৎ গুরুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিটখানেক ধরে তার প্রতিধ্বনি শুনে।

কাবুলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে বেলা বারোটার কামান দাগার শব্দ। সবাই আপন আপন ট্যাঁকঘড়ি খুলে দেখবেন—হাতঘড়ির রেওয়াজ কম—ঘড়ি ঠিক চলছে কি না। কাবুলে এ রেওয়াজ অলঙ্ঘনীয়। ঘড়ি না বের করা স্রবের লক্ষণ,—'আহা যেন একমাত্র ওঁয়ার ঘড়িরই চেক-আপের দরকার নেই—'

যাঁদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দেখালো না, তাঁরা সদ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। কাবুলের কামান নাকি ইহজন্মে কখনো ঠিক বারোটার সময় বাজেনি। কারো ঘড়ি যদি ঠিক বারোটা দেখাল তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগী-খুনী—ও'দের ঘড়ির মত বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্তির চোখেমুখে যে অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই তখন সে ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

মীর আসলম আরবী ছন্দে ফার্সী বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে ভট-চাযরা যে রকম সংস্কৃতের তেলে ডোবানো সপসপে বাংলা বলে থাকেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভ্রাতঃ, 'চহার-মগজ্ শিকন' কি বস্তু তস্য সন্ধান করিয়াছ কি ?'

আমি বললুম, 'চহার' মানে 'চার' আর 'মগ্জ্' মানে 'মগজ', 'শিকস্তন' মানে 'টুকরো টুকরো করা।' অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ ভাঙা যায়, এই আরবী ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হবে আর কি ?'

মীর আসলম বললেন, 'চহার-মগজ' মানে 'চতুর্মস্তিষ্ক' অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু যোগরূঢ়ার্থে ঐ বস্তু আক্ষোট অথবা আখরোট। অতএব 'চহার-মগ্জ্-শিকন্ বলতে শক্ত লোহাড় হাতুড়ি বোঝায়।' তারপর দাগীঘড়িওয়ালা প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয় বরাদরে আজীজে মন্, হে আমার প্রিয় ভ্রাতঃ যোগরূঢ়ার্থে ঘটিকা-যন্ত্র অথচ ধর্মত কার্যত যে দ্রব্য 'চহার-মগজ্-শিকন' সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক অঙ্গরক্ষার আস্তরণ মধ্যে পরম প্রিয়তমার ন্যায় বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন ? অপিচ পশ্য, পশ্য, অদূরে উদ্যানপ্রান্তে পরি-চারকবৃন্দ উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে উপলখন্ড দ্বারা অক্ষরোট ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হইতেছে। তোমার হৃদয় কি ঐ উপলখন্ডের ন্যায় কঠিন অথবা বজ্রাদপি কঠোর ?'

দাগী ঘড়ি রাখা এমনি ভয়ঙ্কর পাপ যে প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যন্ত জুতসই উত্তর দিতে পারলেন না। সাদামাটা কি একটা বিড় বিড় করলেন যার অর্থ 'এক মাঘে শীত যায় না।'

www.MurchOna.com

মীর আসলম বললেন, ঐ সহস্র হস্ত উচ্চ পর্বতশিখর হইতে তথা-কথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধূম্র উদ্‌গিরণ করে—কখনো কখনো তজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা দ্বিপ্রহরে তোপচী লক্ষ্য করিল যে, বিস্ফোরক-চূর্ণের অনটন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তের অস্ত্রশালা হইতে প্রয়োজনীয় চূর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া আইসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দূরার্থে বিপণি মধ্যে প্রবেশ করত অষ্টাধিক পাত্র চৈনিক যূষ পান করিল প্রয়োজনীয় ধূম্রচূর্ণ আহরণ করত পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। স্বীকার করি, অপ্রশস্ত দিবালোকেই সেইদিন নাগরিকবৃন্দ কামানধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল. কিন্তু ভ্রাতঃ সইফুল আলম, সেইদিনও কি তোমার 'চহার-মগজ্‌-শিকন' কন্টকে কন্টকে দ্বাদশ ঘটিকার লাঞ্ছন অংকন করিয়াছিল ?'

আমি বললুম, 'এ রকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে—তাকে বলা হয়, আঁব-পাড়ার ঘড়ি।'

সইফুল আলম আর মীর আসলম ছাড়া সবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আঁব' কি ? সইফুল আলম বোমবাই হয়ে প্যারিস যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মীর আসলম ?

তিনিই বললেন, 'আম্র অতীব সুরসাল ভারতীয় ফলবিশেষ। দ্রাক্ষা আম্রের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্যা এ যাবৎ সমাধান করিতে পারি নাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কিন্তু আপনি আম খেলেন কোথায় ?'

মীর আসলম বললেন, 'চতুর্দশ বৎসর হিন্দুস্থানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অদ্য তোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে হইল ? কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ্য করিয়াছি তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত-আফগানিস্থানের সংস্কৃতিগত যোগা-যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিব। উপস্থিত পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অনুগত ভৃত্য আবদুর রহমান খান তোমার মুখারবিন্দ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান।'

কী আপদ, এ আবার জুটল কোত্থেকে ?

দেখি হাতে লুঙ্গি তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, 'খানা তৈরী হতে দেরী নেই, যদি গোসল করে নেন।'

ইয়ারদোস্তের দু'চারজন ততক্ষণে বাঁধে নেমেছে। সবাই কাবুল-বাসিন্দা, সাঁতার জানেন না, জলে নামলেই পাথরবাটি। মাত্র একজন চতুর্দিকে হাত-পা ছুঁড়ে, বারিমন্থনে গোয়ালন্দী জাহাজকে হার মানিয়ে

www.MurchOna.com

বিপুল কলরবে ওপারে পৌঁছে হাঁপাচ্ছেন। এপারে অফুরন্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরাট আত্মপ্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা কখনো ডুব-সাঁতার দেখেনি।

ঐ একটিবারই এপার-ওপার সাঁতার কেটেছিলুম। ও রকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাত দুপুরে পানাঠাসা এঁদো পুকুরেও হয় না। সেই দু'মিনিট সাঁতার কাটার খেসারতি দিয়েছিলুম ঝাড়া একঘন্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজিয়ে, সব্বাঙ্গে অশথপাতার কাঁপন জাগিয়ে।

মীর আসলম অভয় দিয়ে বললেন, 'বরফগলা জলে নাইলে নিওমোনিয়ার ভয় নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মানসসরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কিসের?' কিন্তু বুঝতে পারলুম বন্ধু বিনায়ক রাও মসোজী মানস-সরোবরে ডুব দেবার পর কেন তিন ঘন্টা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি, কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মীর আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সক্কলেরই দৃঢ়-বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনো প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আবার না হয় ডুব-সাঁতার দেখাচ্ছি।'

সবাই 'হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি' বলে ঠেকালেন। অবশ্য মৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের জান বাঁচানো অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

তিন টুকরো পাথর, বাগান থেকেই কুড়োনো শুকনো ডাল-পাতা আর দু'চারটে হাঁড়িবাসন দিয়ে উত্তম রান্না করার কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলী রাঁধুনীতে কোনো তফাত নেই। বিশেষত মীর আসলম ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা পন্ডিত। অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকার সময় ইনি রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর তদারকিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাফিজের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি সমস্ত বাগান নাক ডাকাচ্ছে—একমাত্র হুঁকোটা ছাড়া। তা আমরা যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে এক লহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয়নি। কিন্তু কাবুলী তামাক ভয়ংকর তামাক—সাক্ষাৎ পেল্লাদ মারা গুলী। প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায়, পাহাড়

www.MurchOna.com

থেকে ফেলে, পাষাণ চাপা দিয়ে মারা যায়নি, কিন্তু এ তামাকে তিনি দুটি দম দিলে আর দেখতে হত না। এ তামাক লোকে যত না খায়, তার চেয়ে বেশী কাশে। ঠান্ডা দেশ বলে আফগানিস্থানের তামাক জাতে ভালো, কিন্তু সে তামাককে মোলায়েম করার জন্য চিটে-গুড়ের ব্যবহার কাবুলীরা জানে না, আর মিষ্টি-গরম ধিকিধিকি আগুনের জন্য টিকে বানাবার কায়দা তারা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

পড়ন্ত রোদে দীর্ঘ তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগান জুড়ে ফালি ফালি দাগ কেটেছে। সবুজ কালোর ডোরাকাটা নাদুসনুদুস জেব্রার মত বাগানখানা নিশ্চিন্দি মনে ঘুমচ্ছে। নরগিস্ ফুল ফোটার তখনো অনেক দেরী, কিন্তু চারাক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে উঠেছে। কল্পনা না সত্যি বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গন্ধ সে দিক থেকে ভেসে আসছে। রাত্তিরে যে খুশবাইয়ের মজলিশ বসবে, তারি মোহড়ার সেতারে যেন অল্প অল্প পিড়িং পিড়িং মিঠা বোল ফুটে উঠছে। জলে ছাওয়ায়, মিঠে হাওয়ায় সমস্ত বাগান সুধাশ্যামলিম, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার ফুট উঁচু, কালো নেড়া পাথরের খাড়া পাহাড়। তাতে এক- ফোঁটা জল নেই, এক মুঠো ঘাস নেই। বুকে একবৃত্তি দয়ামায়ার চিহ্ন নেই—যেন উলঙ্গ সাধক মাথায় মেঘের জটা বেঁধে কোনো এক মনুন্তরব্যাপী কঠোর সাধনায় মগ্ন।

পদপ্রান্তে গুলবাগের সবুজপরী কেঁদে কেঁদে কাবুল নদী ভরে দিয়েছে।

ফকীরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাড়ি ফিরে কোনো কাজে মন গেল না। বিছানায় শুয়ে আবদুর রহমানকে বললুম, জানলা খুলে দিতে। দেখি পাহাড়ের চূড়ায় সপ্তর্ষি। 'আঃ' বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্ত দিন দেখি অজানা ফুল, অজানা গাছ, আধাচেনা মানুষ, আর অচেনার চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়দর্শন শুষ্ক কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তর্ষি দেখে সমস্ত দেহমন জুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্য কি এক আকুল আগ্রহের আঁকুবাঁকু ছড়িয়ে পড়ল।

সস্বপ্নে দেখলুম, মা এবার নামাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন।

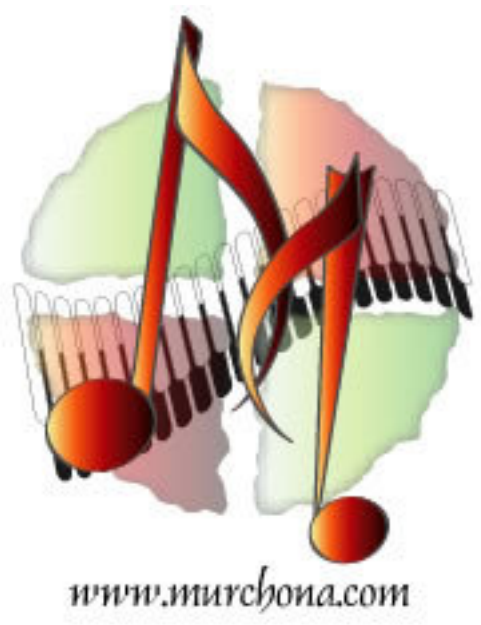


# Deshe Bideshe by Syed Mujtoba Ali

## [Part.1]

**For More Books & Music Visit www.MurchOna.com**
**MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum**
**suman_ahm@yahoo.com**